সুকুমার রায়: জীবনকথা

হেমন্তকুমার আঢ্য

পরিবেশক :

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রকাশ ঃ মহালয়া ১৩৯৭

প্রকাশক ঃ অনিমেষ ভট্টাচার্য। পাইওনীয়ার পাবলিশার্স ঃ
৪৪/১বি বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক ঃ অশোক চৌধুরী। তরু প্রিন্টিং ঃ
১৭৪ রমেশ দত্ত স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

শেষ মলাট ঃ 'পাগলা দাশু' প্রথম মুদ্রণে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা

স্বর্গতা মায়ের স্মরণে

সূচীপত্র

পূর্বকথা

বাঙালীর কাছে সুকুমার রায়ের সাধারণভাবে পরিচিতি 'আবোল তাবোল', 'হ য ব র ল' ইত্যাদি ছোটদের সচিত্র মজার গল্প-কবিতার স্রষ্টা কৌতুকদক্ষ শিশু-সাহিত্যিক হিসেবে। কিন্তু এটাই সুকুমার রায়ের পূর্ণ পরিচয় নয়। তাঁর জীবন ও কর্মের পরিচয় নিলে দেখা যায়, তা বহুমুখী, স্বতন্ত্র ও অসামান্যতায় বিশিষ্ট। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী, পত্রিকা-সম্পাদক ও কারিগরী-বিজ্ঞানের একটি শাখায় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমৃত্যু তার গভীর যোগ ছিল। এরই সংশ্লিষ্ট যুবগোষ্ঠীর তিনি ছিলেন অবিসংবাদী নেতা। তাঁর ব্যক্তিত্ব, উদার চিন্তাধারা ও সৃজন-প্রতিভা রবীন্দ্রনাথসহ সেকালের অনেক মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অনেকে একথাও বলেছেন, সুকুমার রায় দীর্ঘজীবী হলে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মান্দোলনে নবীন চেতনা, প্রাণশক্তি ও কর্মের জোয়ার আসত।

সাহিত্য-স্রষ্টা হিসেবে তিনি প্রত্যক্ষভাবে ছোটদের, পরোক্ষভাবে সকল বয়সী মানুষের জন্য যে-সব গল্প-কবিতা, প্রবন্ধ বা নাটক রচনা করেছিলেন, তার প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিজের প্রতিভা ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। আবার তাঁর সাহিত্যের মধ্যে এমন কিছু রচনা আছে যা রসমূল্যে চিরস্থায়ী, যার তুলনা সবদেশে সবকালে কমই পাওয়া যায়। তাঁর বাংলা ও ইংরাজিতে লেখা প্রবন্ধ-সহ মননধর্মী লেখাগুলি তাঁর মনোজগতের ব্যাপ্তি ও গভীরতাকে তুলে ধরে।

মুদ্রণ-বিজ্ঞানের একটি শাখা ফটো-টেকনলজি ও প্রসেস-শিল্পে তাঁর অধিকার সে সময়ে একমাত্র উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। সুকুমারই দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি ফটো-টেকনিক শাখায় ইংলন্ডের সর্বোচ্চ উপাধি F. R. P. S. অর্জন করেছিলেন। প্রসেস-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি দু'একটি নতুন পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছিলেন। প্রসেস-শিল্প ও সংলগ্ন দু'একটি বিষয়ে তাঁর অবদান উপেন্দ্রকিশোরের বিস্ময়কর অবদানের সঙ্গে মিলিয়ে বিশেষজ্ঞরা বর্তমানে আলোচনা করছেন।

সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁর আঁকা ইলাসট্রেশনগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতের। ননসেন্স-সাহিত্যের সঙ্গে ননসেন্স-ছবির রাজযোটক অবস্থান দেখা যায় তাঁর রচনায়। বিশ্বসাহিত্য খুব কমসংখ্যক ননসেন্স-স্রষ্টাই লেখায় ও রেখায় যুগপৎ সমান অধিকারের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। এই ক্ষেত্রেই সুকুমারের সব পরিচয় ছাপিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যের হাস্যরসিকতা।

সুকুমারের মৃত্যুর ১৭ বছর পর ১৯৪০ সালে তাঁর সহধর্মিনী সুপ্রভার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ সুকুমারের 'পাগলা দাশু' গল্প-সংকলনের যে সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধটি রচনা করেছিলেন সুকুমারের জীবন ও প্রতিভার ক্ষেত্রে প্রবেশকরূপে তা এখানে তুলে দেওয়া যায়:

'সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁর ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল সেইজন্যই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন। বঙ্গ সাহিত্যে ব্যঙ্গ রসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়েছে কিন্তু সুকুমারের অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না। তাঁর এই বিশিষ্ট হাসির দানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অকাল মৃত্যুর সকরুণতা পাঠকদের মনে চিরকালের জন্য জড়িত হয়ে রইল।'

বেশ কিছুকাল আগে সুকুমার রায় প্রসঙ্গে যখন জীবনী রচনার কাজ শুরু করি, তখন তাঁর সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহ সহজসাধ্য ছিল না। তাঁর জীবনী বলতে ছিল একমাত্র লীলা মজুমদারের 'সুকুমার রায়' গ্রন্থটি। বাজারে পাওয়া যেত না বলে আগ্রহী পাঠকের পক্ষে সেটি পড়তে সাহায্য নিতে হত কোনো ভাল লাইব্রেরির। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ আকরগ্রন্থ বলতে ছিল সুকুমার-ভগিনী পুণ্যলতা চক্রবর্তী রচিত স্মৃতিকথা 'ছেলেবেলার দিনগুলি'। এই বই থেকে এক অসাধারণ পরিবার সম্বন্ধে বহু কথা জানা গেলেও, সুকুমার পুণ্যলতা—এঁদের যৌবনকালে এসে গ্রন্থটির সমাপ্তি; কালসীমা বড়জোর ১৯০৭-৮ সাল অবধি। অসামান্য স্মৃতি ও রচনাশক্তির অধিকারিণী পুণ্যলতা যদি এই গ্রন্থটি না লিখতেন, তাহলে সুকুমার সহ উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারের বহু তথ্য চিরকালের জন্য অজানা থেকে যেত। লীলা মজুমদারের বিভিন্ন সময়ে লেখা স্মৃতিকথা-গুলি থেকেও উপেন্দ্রকিশোরের পরিবার বা সুকুমার সম্বন্ধে বহু দরকারী তথ্য জানা যায়। কিন্তু এর বাইরে সুকুমার-জীবনীর তথ্য-সংগ্রহ করতে গেলে পা বাড়াতে হয় পরিশ্রম-সাপেক্ষ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্র হল বিভিন্ন স্মৃতিকথা, জীবনী, আত্মজীবনী, প্রবন্ধাবলী ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি।

এই অবস্থার বদল ঘটে সুকুমারের জন্ম-শতবর্ষের কিছু আগে। অবশ্য এর অল্প-বিস্তর সূচনা ১৯৭৩ সালে তাঁর রচনাবলীর কপিরাইট চলে যাবার পর। এই সময় দু'একটি সুসম্পাদিত রচনাবলী ও আনুষঙ্গিক আলোচনা ও টীকা-টিপ্পনীর সূত্রে উঠে আসতে থাকে পরিশ্রম ও প্রযত্নলব্ধ নানা তথ্য যা জীবনীকারের কাছে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু সম্পাদিত সুকুমার রচনাবলীর ভূমিকা, গ্রন্থ-পরিচয় অংশ, সুকুমার-শতবর্ষের ক্রমশ সূচনামুখে 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিলেতের চিঠি ও অপর একটি', 'বিলেতের আরো চিঠি', সিদ্ধার্থ ঘোষের 'উপেন্দ্রকিশোর : শিল্পী ও কারিগর', 'সুকুমার রায় : জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি' ইত্যাদি রচনা ও তথ্য-সংগ্রহ, 'প্রস্তুতিপর্ব', 'দেশ', 'যুবমানস', 'আনন্দমেলা' ইত্যাদি পত্রিকার সুকুমার স্মরণ সংখ্যা এবং কিছুকাল আগে প্রকাশিত 'সুকুমার সাহিত্য-সমগ্র'র ৩য় খণ্ড

(অধ্যা. সত্যজিৎ রায়) ও এই খণ্ডের টীকা-ভাষ্য অংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুকুমার-জীবনীর উপাদান সংগ্রহের এক সমৃদ্ধ ক্ষেত্র উন্মোচন করেছে।

পূর্ব-সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে উক্ত ও অনুক্ত বহু গ্রন্থ ও রচনার ভিত্তিতে বর্তমান জীবনীটি রচিত হয়েছে। সুকুমার সম্বন্ধে আগ্রহী, তাঁর সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর রাখেন এমন পাঠক এখানে বহু নতুন তথ্য খুঁজে পাবেন। কিছু কিছু গুরুতর তথ্য-প্রমাদের সংশোধনও এ বইতে আছে—যেমন সুকুমারের বি. এস-সি. পাসের তারিখ ও এফ. এ. পাঠের স্থানটি।

আটের দশকের গোড়ায় অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় সুশোভন সরকারের কাছে তাঁরই একটি স্মৃতিকথার সূত্রে 'ফ্রেটারনিটি' সংস্থা সম্বন্ধে বিশদ তথ্য জানার জন্যে দেখা করেছিলাম। এই সময় তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে শুনি একটি মৌখিক বিবরণ—যার অনুলিখন পরিশিষ্ট অংশের অন্তর্ভুক্ত 'তাতাদার স্মৃতি'। সম্পূর্ণ অপরিচিতের পক্ষে এই দুর্লভ প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছিল সুকুমার সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ও নিজস্ব মহানুভবতার ফলে।

উপাদান-সংগ্রহের প্রথম দিকে শ্রীযুক্তা কল্যাণী কার্লেকার ও শ্রীযুক্তা নলিনী দাশের সঙ্গে আলোচনা করে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। এই সময় দিল্লী-প্রবাসী সৌরীন রায় মহাশয়ের ঠিকানা পেয়েছিলাম শ্রীযুক্তা নলিনী দাশের কাছ থেকে। সুকুমার প্রসঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি আমার চিঠির উত্তরে জানিয়েছিলেন যথেষ্ট আন্তরিকতা ও আগ্রহের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুকাল পরে আবার যোগাযোগের চেষ্টা করতে গিয়ে জানতে পারি এই শ্রদ্ধেয় মানুষটি ইতিমধ্যে পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছেন।

নিয়ত সাহায্য, পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র জানার কাছ থেকে। সুকুমার-প্রসঙ্গে অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, তথ্য-সূত্র, প্রাসঙ্গিক নির্দেশ দেওয়া থেকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক পূজনীয় শ্রীযুক্ত অলোক রায়। এঁদের স্নেহসঞ্জাত সহায়তা ও পথ্যানির্দেশ না পেলে এই আলোচনা বর্তমান আকৃতি পেত কিনা সন্দেহ।

এই গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি একটি অস্পষ্ট ফটো-কপি থেকে উদ্ধার করে দিয়েছেন অধ্যাপক শ্রীঅপূর্বকুমার সর। শ্রীযুক্ত সত্য-প্রসন্ন দত্ত, শ্রীশৈবাল ঘোষ, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীঅভিজিৎ দাশগুপ্ত, শ্রীনিশীথ ভড়, শ্রীসন্দীপ দত্ত, শ্রীনির্মলকুমার দে, শ্রীকাশীনাথ হাজরা, শ্রীস্নেহাশিস্ শুকুল, শ্রীমোহন দত্ত, অধ্যাপক শ্রীদেবাশিস্ মজুমদার, শ্রীমতী বনানী দে, শ্রীমতী শুভ্রা আঢ্য, প্রেসিডেন্সি কলেজের বর্তমান সহ-গ্রন্থাগারিক, তরু প্রিণ্টিং-এর শ্রীঅশোক চৌধুরী ও কর্মীবন্ধুরা, অধ্যাপক শ্রীমানসকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীঅনিমেষ ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকের নানাভাবে সহায়তার কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, সেই সঙ্গে শ্রীশিবপ্রসাদ ঘোষের কথাও—সুদীর্ঘ সময় যাঁর অব্যাহত আনুকূল্য পেয়েছি।

মহালয়া, ১৩৯৭ হেমন্তকুমার আঢ্য

প্রথম অধ্যায়

১৮৮৭ - ১৯০৪

প্রসঙ্গ

১

মধ্য-কলকাতার ঠনঠনে-অঞ্চলে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের যে উপাসনা-মন্দির ও সমাজ-ভবনটি আছে, তার প্রায় বিপরীত দিকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের ওপর ১৩ নম্বর যে বিশাল-বাড়িটি দেখা যায়, এককালে সেটির পরিচয় ছিল 'লাহাবাবুদের বাড়ি' বলে। [বর্তমানে অবশ্য বাড়িটি ভাগ হয়ে গেছে, ফলে নম্বরও বদলেছে।] এই বাড়ির সামনের অংশে দোতলার একটি ঘরে[১] সুকুমার রায়ের জন্ম হয়। তাঁর জন্মের তারিখঃ ৩০ অক্টোবর, ১৮৮৭ [১৩ কার্তিক, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ]।

সুকুমারের পিতা উপেন্দ্রকিশোরের নাম শিক্ষিত বাঙালীর কাছে কোনো পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। সুকুমারের মাতৃকুলও বিশিষ্ট; সেকালের স্বনাম-খ্যাত-পুরুষ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের [১৮৪৪-১৮৯৮] দৌহিত্র সুকুমার। সুকুমারের মা বিধুমুখী [?—৭ জানু. ১৯২৭] দ্বারকানাথের প্রথম পক্ষের জ্যেষ্ঠ কন্যা।

বিবাহের আগে উপেন্দ্রকিশোর সম্ভবত ৫০ নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে গগন হোম, প্রমদাচরণ সেন, হেমেন্দ্রমোহন বসু প্রমুখের সঙ্গে একত্রে থেকেছেন। ওই বাড়ির বাসিন্দাদের অধিকাংশই ব্রাহ্ম বলে সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বাড়িটির পরিচিত ছিল 'ব্রাহ্ম-কেল্লা' বলে। তখন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন ওই তরুণ-ব্রাহ্মদের নেতা।[২]

উপেন্দ্রকিশোর বিধুমুখীকে বিবাহ করার অল্পকাল পরেই ১৮৮৫ খ্রি.-এর কোনো এক সময় থেকে ১৩ নং কর্নওয়ালিশের 'লাহাবাবুদের বাড়ি'র দোতলার সামনের অংশ ভাড়া নিয়ে সংসার শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় শুধু উপেন্দ্রকিশোর নন, সেকালের অনেক গণ্য-মান্য ব্যক্তি ওই বাড়িতে বাস করতেন। আবার বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এই বাড়িটি।

সে-সময়ে এই বিশাল বাড়িটির ভেতরের অংশে—তেতলায় থাকতেন দ্বারকানাথ ও তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। 'কুলী-কাহিনী' খ্যাত লেখক ও ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন [পরবর্তী কালে বিখ্যাত পরিব্রাজক ও সন্ন্যাসী রামানন্দ ভারতী][৩], ব্রাহ্ম-ধর্মজ্ঞ সুপণ্ডিত আচার্য সীতানাথ তত্ত্বভূষণ[৪], ব্রাহ্ম বিনোদবিহারী রায়[৫] প্রমুখ বাস করতেন এই বাড়িতে। উপেন্দ্রকিশোরের সংসারে অন্যান্যদের সঙ্গে থাকতেন ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক ও আচার্য নবদ্বীপ চন্দ্র দাস[৬] [নভেম্বর, ১৮৪৭—২৪.১.১৯২৪]।

এই বাড়ির নিচের অংশে ছিল 'ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়' ও দোতলার কিছুটা অংশ নিয়ে ছিল এই স্কুলের মেয়েদের বোর্ডিং। একতলার একাংশে ছিল

'সঞ্জীবনী' পত্রিকার[৭] [প্রথম প্রকাশ : ৩ বৈশাখ, ১২৯০ সন] সম্পাদকীয় দপ্তর ও প্রেস। কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীশঙ্কর সুকুল প্রমুখের সঙ্গে দ্বারকানাথ ছিলেন এই পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক। 'Hindoo Patriot'-এর যথার্থ উত্তর-সাধক—সেকালে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই পত্রিকার সঙ্গে আমৃত্যু জড়িত ছিলেন দ্বারকানাথ।

কথিত আছে, হিন্দুমেলার স্রষ্টা বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশানাল স্কুল' ও ঠাকুরদাস চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি'র ক্লাস হত এই বাড়িতে। এখানেই নবগোপাল মিত্রের জাতীয় সভার অধিবেশনে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' বিষয়ে বক্তৃতা দেন [১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭২]। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং রাজনারায়ণ বসু লিখছেন : 'ঐ বক্তৃতা ১৩ নম্বর কর্ণওয়ালিশ ভবনে করা হয়। এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অনেক ব্রাহ্ম ঐ বাটীতে বাস করিতেছেন।' 'সেইদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কলিকাতার অনেক মহোদয় বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিলেন।'[৮]

এতদূরও অনুমান করা হয়েছে যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় উল্লিখিত 'সঞ্জীবনী সভা' বা 'হামচুপামুহাফ'র রহস্যময় গুপ্ত বৈঠক বসত এই বাড়িতে।[৯] এ সম্বন্ধে দ্বিধা থাকলেও একালের 'রবি-জীবনী'কার প্রমাণ করেছেন রবীন্দ্র-নাথের বিদ্যালয় জীবনের শুরু এই বাড়ির 'ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি'তে।[১০]

সুকুমার-ভগিনী পুণ্যলতা তাঁর অনবদ্য স্মৃতিকথায় সে-সময়কার এই বাড়ি এবং এর বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার ছবি উপহার দিয়েছেন এইভাবে : 'যে বাড়িতে আমাদের জন্ম হয়েছিল আর শিশুকাল কেটেছিল সেটা ছিল বিরাট একটা সেকেলে ধরনের বাড়ি। তার বাইরের অংশে আমাদের স্কুল হত, ভিতরের অংশের দোতলায় আমরা থাকতাম আর তিনতলায় আমাদের দাদা-মশাইরা [দ্বারকানাথ, কাদম্বিনী ও তাঁদের সন্তানাদি] থাকতেন। একতলার বাইরের ঘর, বারান্দা, আর উপরে উঠবার চওড়া কাঠের সিঁড়ির সঙ্গেই আমাদের পরিচয় ছিল—পিছনে আরো কত ঘর ছিল, সেখানে কারা থাকত, সেসব ভাল করে মনে নেই। শুধু রান্নাবাড়ির উঠোনের প্রায় আধখানা জুড়ে প্রকাণ্ড চৌবাচ্চাটার কথা মনে পড়ে। তা'তে একতলার লোকেদের মাছ জীয়ানো থাকত, ডাব, পান, শাকের আঁটি ভাসানো থাকত, তার মধ্যে নেমে ওরা ডুব দিয়ে স্নান করত। আমাদের দোতলার রান্নাঘরের বারান্দা থেকে সব দেখতে পেতাম।'[১১]

বহু ব্রাহ্ম-পরিবার যেমন এই বাড়িতে বাস করতেন, তেমনি আশপাশ অঞ্চলটি 'সমাজ-পাড়া' বা 'ব্রাহ্ম-সমাজ পাড়া' নামে পরিচিত ছিল। সুকুমারের জন্ম ব্রাহ্মধর্মাদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্র, আন্দোলন, পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সাহচর্যের এই পরিবেশে।

১ঃ লীলা মজুমদার, 'সুকুমার রায়', ১৩৭৬, পৃ. ৯। ২ঃ গগন চন্দ্র হোম, 'জীবনস্মৃতি', পৃ. ১৩-১৪। ৩ঃ রাধারমণ মিত্র, 'কলিকাতা-দর্পণ', ১৯৮০, পৃ. ১৩-১৬। ৪ঃ রজনীকান্ত গুহ, 'আত্মচরিত', ১৯৪৯, পৃ. ২৪২। ৫ঃ অমর দত্ত, 'আসামে চা-কুলী আন্দোলন ও দ্বারকানাথ', ১৯৭৮, পৃ. ৪৩। ৬ঃ পুণ্যলতা চক্রবর্তী, 'ছেলেবেলার দিনগুলি', ১৩৮১, পৃ. ১০৭-১০৯। ৭ঃ রজনীকান্ত গুহ··, পৃ. ২৪২-২৪৩। ৮ঃ রাধারমণ···, পৃ. ১৪। ৯ঃ রাধারমণ মিত্র, 'কলকাতার বাড়ি, বাগান ও বাগানবাড়ি', "এক্ষণ" শারদীয়া, ১৩৮৭, পৃ. ১২০-১২১। ১০ঃ প্রশান্ত কুমার পাল, 'রবি-জীবনী', ১ম খণ্ড. ১৩৮৯, পৃ. ৬৪, ৬৫। ১১ঃ পুণ্যলতা ··, পৃ. ৯।

২

উনিশ শতকের একেবারে শেষভাগে সুকুমারের জন্ম। তাঁর জন্মের ন'বছর আগে ১৮৭৮ খ্রি.-এ সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু ঘটেছে তাঁর জন্মের যথাক্রমে ৪, ৭, ১৫ ও ১৮ বছর পর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মৃত্যু ঘটেছে তাঁর জন্মের প্রায় একবছর আগে।

সুকুমারের জন্মের প্রায় একবছর আগে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, তৎকালে সদ্য প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসের দুটি চরিত্র—হাসি ও তাতার নামানুসারে সুখলতা ও সুকুমারের ডাক-নাম রাখা হয়।

উনিশ শতকের শেষে জন্মগ্রহণ করে যাঁরা নানাক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁরা রেনেসাঁ-পুরুষদের প্রস্তুত ক্ষেত্রেই নিজেদের কর্ম ও সাধনার ফসল ফলিয়েছেন। সুকুমারের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। নবজাগরণের পুরোধা-পুরুষেরা যদি ক্ষেত্র প্রস্তুত না করে যেতেন, তাহলে অনেকের মত সুকুমারেরও আবির্ভাব ঘটত কিনা সন্দেহ।

সুকুমারের জন্মবছর ১৮৮৭-তে বা তার কিছু আগে পরে জন্মেছেন এমন বিখ্যাত ব্যক্তিদের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা করা যায়। এ থেকে তাঁর সমবয়সী ব্যক্তিত্ব ও সমসাময়িক পরিবেশকে কিছুটা অনুমান করা যাবেঃ ১৮৮৫ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু। ১৮৮৬ঃ অজিতকুমার চক্রবর্তী। ১৮৮৭ঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, বিনয়কুমার সরকার, মানবেন্দ্রনাথ রায়, দার্শনিক অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—প্রমুখ।

এই প্রসঙ্গে সুকুমার রায়ের মাত্র ছত্রিশ বছর আয়ুষ্কালের মধ্যে সংঘটিত স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক নানা ঘটনার একটি আংশিক তালিকা করা যায়; এ থেকে সুকুমারের সমকালের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে পরোক্ষভাবে কিছুটা অনুমান করা যাবে।—

১৮৯৩ঃ স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকার ধর্ম মহাসভায় বক্তৃতা। ১৮৯৪ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা। ১৮৯৬-৯৭ঃ রাজদ্রোহ আইনে তিলকের কারাদণ্ড; উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ; বোম্বাই ও বাংলায় প্লেগ-মহামারী। ১৮৯৯ঃ আফ্রিকায় বুয়োর যুদ্ধ। ১৯০২ঃ অনুশীলন সমিতি; ডন সোসাইটি। ১৯০৪ঃ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকা। ১৯০৫ঃ বঙ্গভঙ্গ; অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত; ১৯০৬-৭ঃ 'যুগান্তর' পত্রিকা; বাংলায় বিপ্লবী চেতনার প্রসার। ১৯০৮ঃ ক্ষুদিরামের ফাঁসি; তিলকের মামলা। ১৯১০ঃ 'গীতাঞ্জলি' ১৯১১-১২ঃ দুই বঙ্গের মিলন; কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী। ১৯১৩ঃ রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার। ১৯১৬ঃ 'নিখিল ভারত হোমরুল লিগ' গঠন; স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যৌথ-সংগ্রামের পরিকল্পনা। ১৯১৭ঃ রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ১৯১৮ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি। ১৯১৯ঃ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে চম্পারণ সত্যাগ্রহ; জালিওয়ানাবাগ গণহত্যা। ১৯২০-২১ঃ অসহযোগ আন্দোলন; ভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা; তিলকের মৃত্যু; বোম্বাই-এ চার দিনের রাজনৈতিক ধর্মঘট। ১৯২২-২৩ঃ পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা।

৩

কুল-পরিচয় অনুযায়ী সুকুমারের পিতৃপুরুষরা হলেনঃ দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ, সিদ্ধ মৌলিক। গোত্রঃ মৌদ্গল্য। প্রবরঃ ঔর্বচ্যবনভার্গবজামদগ্ন্যাপ্লুবৎ। গাঞিঃ কর্ণ সেনাপতি।[১] ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া এবং পরে 'বড় মসুয়া' গ্রামে [বর্তমানে কিশোরগঞ্জ সাবডিভিশনে] তাঁদের পূর্বপুরুষেরা বাস করতেন। এখানে এই পরিবারের বিকাশ, শ্রী ও সমৃদ্ধি। 'মসুয়া'র আগের নাম ছিল 'খুকুর পাড়া'। 'খুকুর পাড়া' থেকে 'মসুয়া' নাম হওয়ার পেছনে আছে এই পরিবারের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা। সেকালে ওই সব অঞ্চলে অনাত্মীয় সম্মানিত বয়োজ্যেষ্ঠকে বলা হত 'মৌসা' অর্থাৎ মেসোমশাই। সুকুমারের বংশে 'রামনারায়ণ' নামে এক পূর্বপুরুষ শিক্ষিত, উচ্চবংশীয় ও জনপ্রিয় ছিলেন বলে তাঁকে লোকে ওই নামেই ডাকত। এইভাবে 'মৌসার বাড়ি' সকলের কাছে প্রচারিত হতে হতে গ্রামের নাম দাঁড়িয়ে গেল 'মৌসা' বা 'মসুয়া'। এই 'মসুয়া', সন্নিকটস্থ ব্রহ্মপুত্রের গর্ভে তলিয়ে গেলে এই পরিবারের লোকজন কাছাকাছি একটি নিরাপদ এলাকায় চলে আসেন। সেটিরও নাম হল মসুয়া বা 'বড় মসুয়া'।[২]

মসুয়ায় বসবাসের আগে সুকুমারের পূর্বপুরুষেরা বাস করতেন 'চাকদহ' গ্রামে [নদীয়া জেলায়]। সে-সময়ে তাঁদের বংশগত পদবী ছিল দেও বা দেব।

'দেও' পদবী থেকে অনুমান করা হয় চাকদহ বা তার পরে মসুয়ায় বসবাসের আগে তাঁরা সম্ভবত থাকতেন বিহারের কোনো অঞ্চলে। 'দেও' উপাধিধারী এই বংশের 'রামসুন্দর' সম্ভবত বাংলাদেশে রায়-পরিবারের আদিপুরুষ। রামসুন্দর দেব থেকে ধরলে সুকুমার রায় এই বংশের চতুর্দশ পুরুষ। বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছেন ইনিই। সম্ভবত ষোড়শ শতকের শেষে বাংলাদেশে তার আগমন ঘটে: 'সে প্রায় চারশ বছর আগেকার কথা। রামসুন্দর দেও বলে একটি যুবক তাঁর পৈত্রিক নিবাস নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রাম ছেড়ে ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি পূর্ব-বাংলার সেরপুরে আসেন। সেরপুরের জমিদার বাড়িতে যশোদলের 'রাজা' গুণীচন্দ্র যুবকের সুন্দর চেহারা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে যশোদলে নিয়ে এলেন। সেখানে ঘরবাড়ি দিলেন, জমিজমা দিলেন, তারপর তার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিবাহ দিলেন। সেই থেকে রামসুন্দর দেও যশোদলবাসী হলেন। তাঁর বংশধরেরা অনেকদিন যশোদলে ছিলেন; পরে ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে মসুয়া গ্রামে এসে স্থায়ী বসবাস করেন।

ক্রমে তাঁরা একদিকে যেমন চাকরি ইত্যাদি করে সাংসারিক উন্নতি করলেন, তেমনি তাঁদের মধ্যে অনেকে বিদ্যায় ও চরিত্রে উন্নত হয়ে লোকের কাছে শ্রদ্ধা সম্মান লাভ করলেন। তাঁদের আসল পদবী 'দেও' (দেব) মুসলমান সরকারে কাজ করার ফলে হল 'রায়'। কেউ কেউ 'খাসনবিশ', 'মজুমদার' ইত্যাদিও লিখতেন।'

'এই বংশের রামকান্ত মজুমদার নানা ভাষায় পণ্ডিত গান-বাজনায় পারদর্শী আর অসাধারণ বলশালী ছিলেন।' 'রামকান্তর ছেলে লোকনাথ রায় পণ্ডিত ও সাধক লোক ছিলেন। সংস্কৃত, আরবী, পারসী ভাষায় তাঁর এমন অধিকার ছিল যে এর মধ্যে যে কোনো ভাষার বই তিনি অন্য ভাষায় অনর্গল পড়ে যেতে পারতেন, বোঝাই যেত না যে অনুবাদ করে পড়ছেন। তিনি যোগ-সাধনা করতেন। সাধন-ভজনের মাত্রা যখন ক্রমে বেড়ে চলল তখন রামকান্তর ভয় হল, পাছে ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। সেই ভয়ে তিনি লোকনাথের সাধনের গ্রন্থ আর অন্যান্য সমস্ত উপকরণ লুকিয়ে চুপি চুপি ব্রহ্মপুত্রের জলে ফেলে দিলেন। মনের দুঃখে লোকনাথ সেই যে শয্যা নিলেন, আর উঠলেন না। তিনদিনের দিন তাঁর মৃত্যু হল'।[৩]

লোকনাথ তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণমণি ও শিশুপুত্র কালীনাথকে রেখে মারা গিয়েছিলেন। এই কালীনাথই সুকুমারের পিতামহ। উপেন্দ্রকিশোরের শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত একটি শ্রদ্ধার্ঘে স্বয়ং সুকুমার তাঁর পিতামহ সম্বন্ধে বলেছেন: 'লোকনাথের পুত্র উদার তেজস্বী স্বাধীনচেতা কালীনাথ রায় লোকসমাজে মুন্সী শ্যামসুন্দর নামেই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ও পার্শীভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রাত্যহিক দেবার্চনাদিতে তিনি স্বরচিত

স্তোত্রাদি ব্যবহার করতেন। তাঁহার কাব্যকুশলতার যে-সকল পরিচয় তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন, দৈবদুর্বিপাকে তাহার সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কায়স্থ হইয়াও তিনি পাণ্ডিত্যগুণে ব্রাহ্মণের বিচার-সভায় মধ্যস্থের আসন লাভ করিতেন। কথিত আছে, তিনি বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে শূদ্রের অনধিকার চর্চায় ব্রাহ্মণসমাজ সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে নিষেধ জানাইবার জন্য এক প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। সেই প্রতিনিধি অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলে আন্দোলনকারীগণ তাহাতেই নিরুৎসাহ হ'ন।

একবার বিধবা বিবাহ সম্পর্কে-জাতিচ্যুত কোন দরিদ্রের গৃহে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও সমাজ-হিতৈষীগণ কর্তৃক নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি সমাজের বাধা নিষেধ ও শাসন অনুশাসনাদি উপেক্ষা করিয়া নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। বলা বাহুল্য "মুন্সী শ্যামসুন্দর"কে জাতিচ্যুত করিতে কাহারও সাহসে কুলায় নাই।'[8]

কালীনাথ রায়ের পাঁচ ছেলে [সারদারঞ্জন, কামদারঞ্জন, মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন ও প্রমদারঞ্জন] ও তিন মেয়ে [গিরিবালা, ষোড়শীবালা ও মৃণালিনী]। কামদারঞ্জনকে হরিকিশোর রায়চৌধুরী দত্তক নিয়ে নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখেন উপেন্দ্রকিশোর। হরিকিশোর ও কালীনাথ এবং রায়পরিবার সম্বন্ধে বহু কৌতূহলোদ্দীপক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য পাওয়া যায় হরিকিশোরের পৌত্র হিতেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখায়ঃ 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির কথা। তখন মৈমনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামে বলতে গেলে রায়-পরিবারের দুটি ঘর বসবাস করে। পাশাপাশি বাড়ি, মাঝে একটু জায়গা। পশ্চিমের বাড়িটিকে "বাবুর বাড়ি" ও পূবের বাড়িটিকে "পূবের বাড়ি" বলা হত। বাবুর বাড়ির কর্তার নাম হরিকিশোর রায় ও পূবের বাড়ির কর্তার নাম কাশীনাথ রায় ওরফে শ্যামসুন্দর মুন্সী।

হরিকিশোর রায় মৈমনসিংহে আইন ব্যবসা করতেন। ···মৈমনসিংহে আইন ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ ও অর্থ উপার্জন করেছিলেন। মসুয়ায় হরিকিশোর বিরাট সম্পত্তি ও জমিদারী কিনে "চৌধুরী" খেতাব নিলেন। এত বিষয়-সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও কিন্তু হরিকিশোরের মনে শান্তি ছিল না কারণ তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

এদিকে হরিকিশোরের জ্ঞাতিদাদা পূবের বাড়ির শ্যামসুন্দর রায়ের পাঁচপুত্র ছিল। ···একদিন হরিকিশোর জ্ঞাতিদাদা শ্যামসুন্দরের কাছে গিয়ে বললেন, "দাদা আমার তো সন্তান-সন্ততি কিছুই নেই—তোমার তো একাধিক পুত্র আছে। দাও না তোমার একটি পুত্রকে আমায় দত্তক? আমি দত্তক নেবো বলে স্থির করেছি কিন্তু বাইরে থেকে দত্তক নিলে, আমার পর এই বিপুল

সম্পত্তি অন্যের হাতে চলে যাবে। তোমার কোন পুত্রকে দত্তক নিলে আমার সম্পত্তিটা পরিবারের মধ্যেই রয়ে যাবে।"

রায় পরিবারের দুই বাড়িতে খুবই হৃদ্যতা ছিল, তাই শ্যামসুন্দর হরিকিশোরের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। তবে শ্যামসুন্দর হরিকিশোরকে জানালেন, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সারদারঞ্জনকে ছাড়া অন্য দুই পুত্রের মধ্যে (তখন কুলদারঞ্জন ও প্রমদারঞ্জনের জন্ম হয় নি) যে কোনো পুত্রকে দত্তক নিতে পারেন।

হরিকিশোর শ্যামসুন্দরের দ্বিতীয় পুত্র কামদারঞ্জনকে দত্তক গ্রহণ করবেন বলে স্থির করলেন এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এক শুভদিনে আনুষ্ঠানিকভাবে হরিকিশোর কামদারঞ্জনকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করলেন। কামদারঞ্জনের নতুন নামকরণ হলো উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।'[৫]

এর বছর দুই পরে হরিকিশোরের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী রাজলক্ষ্মীর গর্ভে হরিকিশোরের পুত্র নরেন্দ্রকিশোর ও দুই কন্যা মনোরমা ও সুরবালার জন্ম হয়।

১ঃ লীলা··, 'সুকুমার রায়', পৃ. ৫ [ভূমিকা]। ২ঃ হিতেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, 'উপেন্দ্রকিশোর ও মসুয়া রায় পরিবারের গল্পসল্প', ১৩৯০, পৃ. ২। ৩ঃ পুণ্যলতা···, পৃ. ১১৮-১২০। ৪ঃ 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র', ৩য় খণ্ড, সম্পা. সত্যজিৎ রায়, ১৯৮৯, পৃ. ৭৭। ৫ঃ হিতেন্দ্রকিশোর·, পৃ. ৩৪।

৪

সুকুমারের মাতামহ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত সমাজ-সেবক তেজস্বীপুরুষ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় [২০.৪.১৮৪৪-২৭.৬.১৮৯৮]। দ্বারকানাথের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর দুটি সন্তান—বিধুমুখী ও সতীশচন্দ্র। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে উপেন্দ্রকিশোর বিধুমুখীকে বিবাহ করেন [তারিখঃ ১৫ জুন, ১৮৮৫]। বিধুমুখীর অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী ভাই সতীশচন্দ্র উপেন্দ্রকিশোরের সংসারে থেকে যান।[১]

দ্বারকানাথ ছিলেন একাধারে লেখক, সাংবাদিক, সমাজ-সংস্কারক ও রাজনৈতিক নেতা। 'সঞ্জীবনী' ছাড়াও পাক্ষিক পত্রিকা 'অবলাবান্ধব' [প্রথম প্রকাশঃ ১৫ এপ্রিল, ১৮৮৩] প্রকাশ তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। দ্বারকানাথের সমাজ-কল্যাণমুখী কাজগুলি ছিল বহুধা বিস্তৃত এবং সেকালের সমাজে সেগুলি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তার ও অসহায় নারীদের রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা ছাড়াও শ্রমিক-আন্দোলনের ব্যাপারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতসভা' তাঁদের সহকারী সম্পাদক দ্বারকানাথকে চা-কুলিদের অবস্থা তদন্ত করার জন্য আসামে পাঠায়। দ্বারকানাথ রামকুমার বিদ্যারত্নের সঙ্গে আসামের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে চা-শ্রমিক-

দের ওপর ব্রিটিশ মালিক ও কর্মচারীদের নির্মম অত্যাচার ও শোষণের কাহিনী সঞ্জীবনীতে প্রকাশ করেন। এর ফলে যে জনমত দৃষ্টি হয়, তার ফলে ১৮৯৩ খ্রি.-এ Inland Emigration Act-এর পুনর্নবীকরণের সময় সরকারকে তার পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হতে হয়।[২] দ্বারকানাথ সাহিত্য-চর্চাও করেছেন। স্কুল-পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি লিখেছেন 'বীরনারী' নাটক বা 'কবিগাঁথা', 'সুরুচির কুটির' ইত্যাদি উপন্যাস। 'না জাগিলে সব ভারত ললনা / এ ভারত আর জাগে না জাগে না'—দ্বারকানাথের লেখা এই গানটি সেকালে মুখে মুখে ফিরত। তাঁর 'শিশুর সদাচার' ইত্যাদি বই পড়ানো হত রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ে।

দ্বারকানাথের সাহস আর তেজস্বিতার গল্প ছিল সেকালে সুবিদিত। দুঃসাহসী দৃঢ়চিত্ত দ্বারকানাথের এমনই একটি তেজস্বিতার কাহিনী ছিল ঃ একটি সাম্প্রদায়িক পত্রিকা একবার প্রগতিশীল মেয়েদের সম্বন্ধে অত্যন্ত অপমানজনক মন্তব্য করে। ক্রুদ্ধ ও একরোখা দ্বারকানাথ রচনাটির কাটিং নিয়ে পত্রিকার অফিসে যান ও সন্ত্রস্ত ও অপরাধী সম্পাদককে সেটি জল দিয়ে গিলে খেতে বাধ্য করেন।[৩] সুকুমারের জীবনেও প্রায় অনুরূপ একটি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। সুকুমার ছাত্রদের জন্যে প্রকাশিত মিশনারিদের একটি কাগজ নিতেন। সেই কাগজে শিক্ষিত মেয়েদের অপমান করে একটি ছাত্রের চিঠি ছাপা হয় ঃ 'সকালে সেটা পড়েই দাদা [সুকুমার] কাগজখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রথমে কাগজের আপিসে গিয়ে পত্রলেখকের ঠিকানা নিয়ে তার বাড়িতে গেল। সে ছেলে স্বীকার করল যে, সে যা লিখেছে, সমস্তই মিথ্যা কথা। কারো উপর রাগ করে সে ঐরকম লিখেছিল এবং সমস্ত কথা প্রত্যাহার করে ক্ষমা চেয়ে একখানা চিঠি তখনই লিখে দিল। সেই চিঠি নিয়ে দাদা সম্পাদক পাদ্রীসাহেবের কাছে গেল, তাকে কাগজখানা দেখিয়ে বলল, আপনাদের কাগজে এরকম লেখান বড়ই দুঃখের এবং লজ্জার কথা।" সাহেব ভারি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন যে তিনি ক'দিন কলকাতায় ছিলেন না, তাতেই এরকম হতে পেরেছে। তিনি দেখলে কখনই এরকম অভদ্র চিঠি ছাপতে দিতেন না, এখনই তিনি এর প্রতিবিধান করবেন (পরদিনই ঐ কাগজে সেই লোকটির ক্ষমা চেয়ে লেখা চিঠিটা ছাপা হয়েছিল, তার সঙ্গে সম্পাদকও ত্রুটি স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।) এত ঘুরে রোদে তেতে পুড়ে অনেক বেলায় যখন দাদা বাড়ি ফিরল, দাদামশাই (নবদ্বীপচন্দ্র দাস) সব শুনে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "হ্যাঁ, দ্বারিক গাঙ্গুলীর উপযুক্ত নাতি বটে।"[৪]

পরিণত বয়সে সুকুমারের তেজস্বিতা ও অন্যায়ের প্রতি রোষের কথা অনেকেই বলেছেন। সুকুমারেরই এক তরুণ সহযোগীর ভাষায় ঃ 'সব সময় [তিনি] যে মজার কথা বলতেন, তা নয় ; কোথাও কোনো অন্যায়ের রেশ দেখলেই তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। অন্যায় সহ্য করা তাঁর ধাতে ছিল না।'[৫]

দ্বারকানাথের মৃত্যু হয় ১৮৯৮ খ্রি.-এর ২৭ জুন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পর কাদম্বিনী গাঙ্গুলী [৮.৫.১৮৬১-৩.১০.১৯২৩] তাঁর সাতটি সন্তানকে নিয়ে ৬ নম্বর গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের নিজস্ব বাড়িতে উঠে আসেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে প্রভাতচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, নির্মলচন্দ্র—এঁরা সম্পর্কে সুকুমারের মামা হলেও সমবয়সী বন্ধুর মতো ছিলেন। নিঃস্বার্থ পরোপকারী প্রফুল্ল-চন্দ্র তরুণ বয়সে মারা যান। প্রভাতচন্দ্র, কাদম্বিনী-কন্যা জ্যোতির্ময়ী– এঁরা রায় পরিবারের সঙ্গে সুখে দুঃখে আমৃত্যু জড়িয়ে ছিলেন।

১ঃ 'কলিকাতা-দর্পণ', পৃ. ৯৫। ২ঃ কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পা. ও সংকলিত 'সঞ্জীবনী', ১৯৮৯, পৃ. [৯]। ৩ঃ লীলা ·'সুকুমার রায়', পৃ. ১৯। ৪ঃ পুণ্যলতা·· ১৩৩-১৩৪ ৫ঃ হিরণকুমার সান্যাল, 'পরিচয়ের কুড়িবছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র', ১৯৭৮, পৃ. ১৬০।

৫

উপেন্দ্রকিশোরের চারভাই-ই নানা গুণের অধিকারী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সারদারঞ্জন [১২.২ ১৮৫৮] ছিলেন গণিতে ও সংস্কৃতে—এম. এ.। প্রথমে সহ-অধ্যক্ষ এবং পরে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষও হয়েছেন [১৯০৯-১৯২৫]। এর আগে আলিগড় ও ঢাকা কলেজেও পড়িয়েছেন। তিনি 'বিদ্যাবিনোদ' ও 'বাচস্পতি' উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর অনূদিত ও সম্পাদিত 'রঘুবংশম্' ১৯১৩-র মধ্যে আটবার ছাপা হয়েছিল। ক্রিকেট খেলায় তাঁর দক্ষতা ও কিছুটা শারীরিক সাদৃশ্যের জন্য তাঁকে ইংলণ্ডের বিখ্যাত ক্রিকেট-খেলোয়াড় ডব্লু. জি. গ্রেসের সঙ্গেও তুলনা করা হত। এ ছাড়া কেউ কেউ তাঁকে 'ফাদার অব বেঙ্গলি ক্রিকেট' এই নামেও অভিহিত করেছেন। সারদারঞ্জন গণিত ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হলেও—সেই যুগেই মনে করতেন—শিক্ষা ক্রীড়াকে বাদ দিয়ে কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাঁর কোচিং পাওয়া মেট্রোপলিটনের ছাত্ররা পর পর পাঁচবার হ্যারিসন ইনটার ইউনিভার্সিটি শিল্‌ড্ জিতে ছিল।[১]

সারদারঞ্জনের কনিষ্ঠ উপেন্দ্রকিশোর তারপর মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন ও সর্বকনিষ্ঠ প্রমদারঞ্জন। মুক্তিদারঞ্জন অসামান্য শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। এ ছাড়া ক্রিকেট খেলাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে ১৮৯৬ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। সারদারঞ্জন ও মুক্তিদারঞ্জন প্রথমে একসঙ্গে থাকতেন। বিয়ের কিছুদিন পর মুক্তিদারঞ্জন তাঁর স্ত্রী কুন্ডলিনীকে নিয়ে প্রথমে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে পরে বিপ্রদাস স্ট্রিটে থাকতেন।[২] মুক্তিদারঞ্জনের ভ্রাতুষ্পুত্রী লেখিকা লীলা মজুমদার তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'ইনি এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন।···গণিত ছিল তাঁর

ধ্যান-জ্ঞান। আমরা যেমন অবসর বিনোদনের জন্য গল্প-কবিতা পড়ি, আমার সুন্দর জ্যাঠামশাই [মুক্তিদারঞ্জনের ডাক নাম] তেমনি শক্ত শক্ত অংক কষে মন ভালো করতেন···নতুন নতুন নিয়ম উদ্ভাবন করতেন।'[৩]

মুক্তিদারঞ্জনের পরের ভাই কুলদারঞ্জন [১৮৭৮-১৯৫০] ১৮৯২ খ্রি.-এর ১২ এপ্রিল [১ বৈশাখ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ] ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর অনুবাদ সাহিত্যের জন্যে। তাঁর জুল ভের্ন, স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের বিভিন্ন উপন্যাস, 'রবীন হুড' (১৯১৪) 'ওডিসিয়ুস' (১৯১৫) ইত্যাদির অনুবাদ বা সংস্কৃত সাহিত্য থেকে কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি ইত্যাদির জন্যে সেকালে 'সন্দেশ'-এর পাঠক-পাঠিকারা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকত।

কুলদারঞ্জন ফটোগ্রাফি ও প্রসেস-সংক্রান্ত কাজকর্মে উপেন্দ্রকিশোরের সহকারী ছিলেন। সেকালের অন্যতম সেরা 'ফটো আর্টিস্ট' বলে তাঁর সুনাম ছিল। বহু সম্ভ্রান্ত ঘরে কুলদারঞ্জনের স্বহস্তে তৈরি বৃহদাকার ফটো-পোর্ট্রেট দেখা যেত। শিবনাথ শাস্ত্রী 'স্বনামা-পুরুষ' গ্রন্থে অন্য অনেকের সঙ্গে যে বিখ্যাত ব্রাহ্ম নবীনচন্দ্র রায়ের কথা শুনিয়েছেন, সেই নবীন রায়ের কন্যা স্বর্ণকুমারীকে বিয়ে করেন কুলদারঞ্জন। বিয়ের পর আলাদা থাকলেও সম্ভবত ১৯১৪ খ্রি.-এ স্ত্রী-বিয়োগের পর কুলদারঞ্জন একমাত্র পুত্র করুণারঞ্জন ও দুই কন্যা মাধুরীলতা ও ইলাকে নিয়ে উপেন্দ্রকিশোরের সংসারে ফিরে আসেন।

উপেন্দ্রকিশোরের সর্বকনিষ্ঠ ভাই প্রমদারঞ্জন তাঁর একটিমাত্র গ্রন্থ 'বনের খবর'-এর জন্য বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। 'সন্দেশ'-এ এটি নিয়মিত প্রকাশিত হত। তিনি শিবপুর বি. ই. কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে 'সার্ভেয়ার জেনারেল অব ইন্ডিয়া'য় চাকরি নেন। প্রথমে জরিপ-বিভাগে আমিন পরে সার্ভেয়ারের কাজ করতেন। প্রমদারঞ্জনকে তাঁর কাজের জন্য চায়না হিল্‌স্‌, লুশাই, জয়ন্তিয়া, শান, কেংটুং, বর্মা, টর্চি ইত্যাদি দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় রীতিমতো বিপদ ও আশঙ্কার মধ্যে জরিপের কাজ করতে হত। 'বনের খবর' এইসব অঞ্চলেরই তাঁর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার বিবরণ। প্রমদারঞ্জন ও কুলদারঞ্জনের ক্রিকেট প্রতিভার উল্লেখ করে 'পুরোনো কথায়' চারুচন্দ্র দত্ত লিখেছেন: 'ক্রিকেট বাঙ্গালী কখনও বিশেষ কিছু করতে পারলে না। তবু ঢাকার সুধন্বা বাখড়ার খেলা যা ছিল, টাউন ক্লাবের কুলদারঞ্জন, শিবপুরের প্রমদারঞ্জন ও বিশপস্‌ কলেজের শ্রীশ দে তার চেয়ে অনেক উন্নতি করে গেলেন।'[৪]

উপেন্দ্রকিশোরের ভায়েদের অনেক বৈশিষ্ট্য সুকুমারের মধ্যেও দেখা যেত। সারদারঞ্জন রাশভারি আর উপেন্দ্রকিশোর কর্মী, আত্মনিবিষ্ট মানুষ হলেও বাকি তিনভাই ক্রীড়া বা কৌতুক-চর্চায় যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। এঁরা

এবং কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর সন্তানেরা সুকুমারের বাল্যকালের নিত্যসঙ্গী।। নির্দোষ মিসচিফ, হাস্য-কৌতুক বা অঘটন ঘটানোয় সবাই সমান উৎসাহী।

উপেন্দ্রকিশোরের বোনেদের মধ্যে বড় গিরিবালা। লীলা মজুমদার তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন: 'বড়পিসিমাকে সকলেই সমীহ করত; ...তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর সাংঘাতিক তেজ ছিল তার।'[৫]

' গিরিবালার ময়মনসিংহের নন্দী চৌধুরী বংশে বিয়ে হয়েছিল [স্বামীর নাম দীননাথ] তিনি সারাজীবনই দেশে থাকতেন, মাঝে কলকাতায় আসতেন. সারদারঞ্জনের বাড়িতে থাকতেন ...'।[৬]

গিরিবালার পরের বোন ষোড়শীবালার বিয়ে হয়েছিল শম্ভুনাথ আইচ রায়ের সঙ্গে।

উপেন্দ্রকিশোরের ছোটবোন মৃণালিনীর বিবাহ হয় হেমেন্দ্রমোহন বসুর সঙ্গে। সে-কালে তিনি এইচ বোস নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। কুন্তলীন তেল, দেলখোস সাবান, তাম্বুলীন পানের মশলা ইত্যাদি ছিল সেকালে অতি বিখ্যাত। স্বনামধন্য আনন্দমোহন বসুর অগ্রজ হরমোহন বসুর পুত্র হেমেন্দ্র-মোহন এ সব ছাড়া কুন্তলীন পত্রিকা, কুন্তলীন গল্প প্রতিযোগিতা, ফোনোগ্রাফ রেকর্ড ইত্যাদির জন্য বাঙালী উদ্যোগী-পুরুষ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। হেমেন্দ্রমোহনের পরিবারের সঙ্গে খুব মেলামেশা ছিল রায় পরিবারের। তাঁর ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ সুকুমার ও তাঁর ভাইবোনদের খেলার সাথীও।

১: সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'উপেন্দ্রকিশোর: শিল্পী ও কারিগর', "এক্ষণ" শারদীয় ১৩৯১ পৃ. ৫৪। ২: 'কলিকাতা-দর্পণ', পৃ. ৯৯। ৩: 'পাকদণ্ডী', ১৯৮৬, পৃ. ১১৫। ৪: 'পুরোনো কথা, ১৩৪৩, পৃ. ১০৭। ৫: 'আর কোনখানে', ১৩৭৪, পৃ. ৭৭। ৬: 'উপেন্দ্রকিশোর', ১৮৮৫ শকাব্দ, পৃ. ৪৩।

৬

সুকুমারের মা বিধুমুখী নিজের ছ'জন ছেলে-মেয়েকে ছাড়াও মানুষ করেছিলেন কুলদারঞ্জনের মাতৃহীন একপুত্র ও দুই কন্যা এবং রামকুমার বিদ্যা-রত্নের সংসার-ত্যাগের পর তাঁর ছোটো মেয়ে সুরমাকে। পুণ্যলতা লিখছেন: 'এই দশটি ছেলেমেয়েকে বুকে করে স্নেহ, মমতা, সেবা দিয়ে ঘিরে মানুষ করে-ছিলেন আমার মা। শুধু নিজের পরিবারেই নয়, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-পড়শী, যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে আসত, সকলকেই তিনি সহজে আপনার করে নিতেন। মাকে দেখতাম, সারাদিন কাজে ব্যস্ত—যেন তাঁর আরাম বা বিশ্রাম বলে কিছুই নেই। বাড়ির সমস্ত কাজ দেখাশোনা করা, বাইরের সকলের খোঁজ-খবর নেওয়া, কার অসুখ, কার কি অভাব, কার কিসে সাহায্য,

দরকার, সব দিকেই তাঁর খেয়াল থাকত। কতবার দেখেছি, কারো হয়ত অসুখ, কিছু খেতে পারছে না শুনে মা নানারকম সুস্বাদু খাবার নিজের হাতে তৈরী করে পাল্কি করে নিয়ে গিয়ে সামনে বসে খাইয়ে আসতেন।' ...'নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে তিনি খুব ভালোবাসতেন।' ...'ডক্টর জি. টি. স্যাণ্ডারল্যাণ্ড ('ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' নামে প্রসিদ্ধ বই যাঁর লেখা) একবার আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণে এসে মার রান্না খেয়ে বলেছিলেন, "আপনি আমাদের দেশে (আমেরিকা) এসে একটা রান্নার স্কুল খুলুন—আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে, সে স্কুলের অত্যন্ত আদর আর খ্যাতি হবে।"[১]

সুকুমারের হৃদয়বত্তা, মহত্ত্ব ও উদারতার অন্তরালে বিধুমুখীর উপস্থিতিকে মিলিয়ে নেওয়া খুব একটা শক্ত নয়।

১ঃ পুণ্যস্মৃতি..., পৃ. ৯৯-১০১।

৭

১৩ নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে ছয় ভাইবোনের মধ্যে সুকুমার ও তার চার ভাই-বোনের জন্ম হয়। সর্বজ্যেষ্ঠ সুখলতা [৬ কার্তিক ১২৯৩—৯. ৫. ১৯৬৯], তারপর সুকুমার। সুকুমারের পর পুণ্যলতা [২৪ ভাদ্র ১২৯৬—২১. ১১. ১৯৭৪], সুবিনয় [১২ অগ্রহায়ণ, ১২৯৭—২৯. ১. ১৯৪৫], শান্তিলতা [১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯—৭ এপ্রিল ১৯১৯]। সুকুমারের ভাইবোনের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ সুবিমলের জন্ম হয় ৩৮/১ শিবনারায়ণ দাস লেনের ভাড়াবাড়িতে [২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩—১৯৭৩]।[১]

সুকুমারের ভাই-বোন সম্বন্ধে লীলা মজুমদার লিখেছেনঃ 'উপেন্দ্রকিশোরের সব ছেলেমেয়ের মধ্যে আশ্চর্য সাহিত্য-প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছিল। সবার বড় সুখলতা রাও তাঁর পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। আমাদের ছোটবেলায় তাঁর 'আরো গল্প' গল্পের বই এবং আরো পরে লেখা 'গল্প আর গল্প', 'নিজে লেখ' 'নিজে পড়' ইত্যাদি যথার্থ আদর পেয়েছে। ...সুখলতার পর পুণ্যলতা, তাঁর লেখা খুদে খুদে গল্প এখনো সন্দেশের পাতায় দেখা যায়। তাঁর 'ছেলেবেলার দিনগুলি' পড়ে কি ছেলে কি বুড়ো আনন্দে অধীর হবে। ...পুণ্যলতার ছোট সুবিনয়ও ৫২ বছর বয়সে পরলোকে গেছিলেন। ইউ. রায়. এণ্ড্ সন্স্ যাঁরা কিনেছিলেন, তাঁরা কয়েকবছর 'সন্দেশ' প্রকাশ করেছিলেন সুবিনয়ের সম্পাদনায়। ...বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছিল তাঁর, মৌলিক রসেও গল্পও অনেক লিখেছিলেন ও খেলাধুলো, ধাঁধা ইত্যাদির বই প্রকাশ করেছিলেন...। ....সুবিমল হলেন সবার ছোট...। তাঁর লেখা 'বেড়ালের হার্মোনিয়াম' গল্প দুঃসময়ে মন ভালো করবার অব্যর্থ ওষুধ।' 'ছোটবোন একজন ছিলেন

শান্তিলতা, মাত্র ২৬/২৭ বছর বয়সে মারা যান। শান্তি... কবিতা সেকালের সন্দেশে বেরিয়েছিল। তার মধ্যে 'ওগো... শোন, রান্না বলে দি শোন' কবিতাটি যে-সব বাঙ্গালী পেরিয়েছে, তারা কখনও ভুলবে না।' [আনন্দবাজার ... বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৭৮, পৃ. ৫৮]

৮. অঙ্কুরণ

সুকুমারের শৈশব-জীবনের প্রথম আটবছর কেটেছিল ... স্ট্রিটের বাড়িতে : 'দোতলার একসারিতে আমাদের কয়েকখানি ঘর, মস্ত চওড়া একটা বারান্দা। ঘরের ভেতরকার কতরকম দৃশ্য ছবির মত মনে পড়ে। বাবা বেহালা বাজাচ্ছেন, ছবি আঁকছেন। মা সেলাই করছেন, ঘরের কাজকর্ম করছেন। · কিন্তু ঘরের চেয়ে বারান্দার কথাই বেশি মনে পড়ে। · ·ভিতরের এই বড় বারান্দাটাই ছিল আমাদের আড্ডার জায়গা। খেলাধুলো, পড়াশুনো, গল্পসল্প, বেশীর ভাগ এইখানেই হ'ত। জন্মদিন প্রভৃতি উৎসবে এইখানেই সারি সারি পাত পেতে নিমন্ত্রণ খাওয়া হ'ত। সন্ধ্যেবেলায় মাঝে মাঝে অনেক ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে এখানে "ছায়াবাজি" (Magic Lantern ও Shadow Play) দেখতাম। রোজ সন্ধ্যায় ছিল এখানে বসে গল্প শোনার পালা—কত দেশ-বিদেশের কথা, রূপকথা রামায়ণ, মহাভারতের গল্প, বাবা-মায়ের ছেলেবেলার গল্প, হাসির গল্প, দুঃখের গল্প, যুদ্ধ ও বিপদের কত রোমাঞ্চকর গল্প।'[২]

১৩ নম্বর কর্নওয়ালিশের বাড়ির সামনের অংশে ছিল 'ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়'। বার বছর বয়স অবধি ছেলেরাও সেখানে পড়তে পাবত। দোতলায় ছিল এই স্কুলের মেয়েদের বোর্ডিং। উপেন্দ্রকিশোর ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ যে 'রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার ক্লাসও হত এই বাড়িতে। সুকুমার ও তাঁর ভাইবোনের প্রাথমিক শিক্ষা এই স্কুলেই।

সুকুমার শৈশবে ছিলেন দুরন্ত, চঞ্চল ও উৎসাহী : '···দাদা আবার তেমনি চঞ্চল ও স্ফূর্তি বাজ। সব কিছুতেই দাদার উৎসাহ, খেলাধুলোয় সেই আমাদের পাণ্ডা। ছোটবেলা থেকেই না কি দাদা খুব চঞ্চল ছিল। তার কলের খেলনা-গুলো সে ঠুকে ঠুকে ভেঙ্গে দেখত কি করে চলে। বাজনাগুলো ভেঙ্গে দেখবার চেষ্টা করত কোথা থেকে আওয়াজ বেরোয়। ছোট লাঠি হাতে বোর্ডিংয়ের মেয়েদের ছাতময় তাড়া করে বেড়াত। প্রকাণ্ড তিনতলার ছাতের একদিকের পাঁচিলটা খুব উঁচু ছিল তার মধ্যে খানিক উঁচুতে একটা গোল ফুটো ছিল। দাদা একবার নাকি সে ফুটো দিয়ে গলে বাইরের কার্নিসে নামবার চেষ্টা করেছিল ··শুধু ছোট্ট একখানি জুতো-পরা পা ভিতরের দিকে ছিল। হঠাৎ আমাদের বড় মামা [সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়] দেখতে পেয়ে দৌড়ে গিয়ে পা-টা ধরে চীৎকার করে সবাইকে ডাকলেন।'[৩]

দরকা

কি

.দারঞ্জন ও প্রমদারঞ্জন, সারদারঞ্জন ও হেমেন্দ্রমোহন বসুর ছেলেমেয়েরা, বয়সী মামা-মামী ও অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে, বাবা-মার স্নেহ-সাহচর্য নিয়ে উজ্জ্বল সুকুমারের ছেলেবেলার দিনগুলি। কুলদারঞ্জনের মাতৃহীন ছেলে-মেয়েরা উপেন্দ্রকিশোরের সংসারেই মানুষ হয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোরের পাশের ঘরে থাকতেন রামকুমার বিদ্যারত্ন। তিনি স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসার ত্যাগ করে গেলে তাঁর ছোট মেয়ে সুরমাকে মানুষ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। পরে ছোটভাই প্রমদারঞ্জনের সঙ্গে তাঁর বিবাহও দিয়েছিলেন। পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে থাকতেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ও আচার্য নবদ্বীপচন্দ্র দাস। সম্পর্কে তিনি বিধুমুখীর 'মামাবাবু', ছেলেমেয়েদের 'দাদামশাই'।

বিদেশি অতিথিদের মধ্যে সুকুমার ও তাঁর ভাই-বোনেরা দেখেছিল ব্রাহ্মধর্মানুরাগী কার্ল হ্যামারগ্রেনকে [১৮৫৪—১৮৯৪]। ১৮৯৪-এ তাঁর সকরুণ অন্তিমযাত্রা অন্যান্যদের সঙ্গে ছোটদেরও বিষণ্ণ করে দিয়েছিল।[৪] হ্যামারগ্রেনকে হিন্দুমতে দাহ করা নিয়ে সেকালে যথেষ্ট বাক্-বিতণ্ডা হয়েছিল; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে সমালোচকদের তীব্র ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

বিধুমুখীর রুগ্ন ও প্রতিবন্ধী ভাই সতীশচন্দ্র উপেন্দ্রকিশোরের সংসারেই থাকতেন। লীলা মজুমদার তাঁর সম্পর্কে লিখছেন: '..দ্বারিক গাঙ্গুলীর প্রথম পক্ষের একমাত্র ছেলে, জ্যাঠাইমার [বিধুমুখী] সহোদর। শিশুবয়সে কে কোল থেকে ফেলে দিয়েছিল। মাথায় চোট লেগে ঐরকম হয়ে গেছিলেন। চিরকাল জ্যাঠাইমা মা-মরা বিকলাঙ্গ ছোট ভাইকে বুকে করে মানুষ করেছিলেন। বিয়ের পর সঙ্গে করে স্বামীর বাড়িতে এনেছিলেন; সতীশমামা মারাও গেছিলেন তাঁর কোলের কাছে শুয়ে।' 'ভারি রসবোধ ছিল তার শরীরটাই বিকল হয়েছিল, মাথাটা সাফ ছিল।'[৫] উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে ছিল তাঁর সম্পর্ক ছিল মধুর। একবার তাঁকে ময়মনসিংহ থেকে মজা করে লিখেছিলেন:

সৈত্যাদা, হাঃ-হাঃ-হাঃ।
কথাডা শুইন্যা যা,
কৈলকাতা বৈস্যা খা
দৈ, ছানা, ঘী, পাঁঠা।
ময়মনসিংহ ঘোড়াড্ডিম!
দেখবার নাই কিচ্ছু ভাই,
সার্ভেণ্ট ইজ্ ইস্টুপিড্
রাইন্ধ্যা থোয় খাইচ্ছ্যা তাই।[৬]

প্রাণচঞ্চল পরিবেশে, সঙ্গী-সাথী ও নানান আত্মীয়-স্বজনের সাহচর্যে সুকুমারের ননসেন্স ও হাস্য-রসিক প্রতিভার বিকাশ ঘটে। পরবর্তীকালের 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী'র ল্যাগব্যাগর্নিস, হ্যাংলাথেরিয়াম বা 'খিচুড়ি'

কবিতার বিদঘুটে জোড়লাগানো জন্তুদের স্রষ্টার প্রতিভার বীজটির অঙ্কুরণ ঘটছিল এই সময় থেকেই :

'ছোটবেলা থেকে দাদা চমৎকার গল্প বলতে পারত। বাবার প্রকাণ্ড একটা বই থেকে নানা জীবজন্তুর ছবি দেখিয়ে টুনী [শান্তিলতা] মণি [সুবিনয়] আর আমাকে [পুণ্যলতা] অনেক আশ্চর্য মজার গল্প বলত। বইয়ের গল্প ছাড়াও নিজের মনগড়া কত অদ্ভুত জীবের গল্প—মোটা ভবন্দোলা কেমন দুলে দুলে থপথপিয়ে চলে, 'ম'তু পাইন' তার সরু গলাটা কেমন গেঁট পাকিয়ে রাখে, গোলমুখে ভ্যাবাচোখ কোম্পু অন্ধকার বারান্দার কোণে দেয়ালের পেরেকে বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকে।'[৭]

অসূয়াশূন্য, আঘাতশূন্য, উজ্জ্বল হাস্যরস সৃষ্টিতে আপামর বাঙালীকে যিনি মুগ্ধ করেছেন বাল্যকালের একটি নির্দোষ ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে তাঁর ভাবী পরিচয় ফুটে ওঠে। বালক সুকুমার 'রাগ বানাই' বলে একটি খেলার উদ্ভাবন করেছিলেন। খেলাটি এ' রকম : 'হয়ত কারো ওপর রাগ হয়েছে অথচ তার শোধ নিতে পারছি না, তখন দাদা [সুকুমার] বলত, "আয়, রাগ বানাই।" বলেই সে লোকটার সম্বন্ধে যা তা অদ্ভুত গল্প বানিয়ে বলতে আরম্ভ করত। তার মধ্যে বিদ্বেষ বা হিংস্রভাব কিছুই থাকত না, সে ব্যক্তির কোনো অনিষ্ট চিন্তা থাকত না, শুধু মজার কথা। ··দাদার 'হ য ব র ল' বইয়ের "হিজি-বিজ্-বিজ্" যেমন "মনে কর—" বলে যত রকম উদ্ভট কল্পনা করে নিজে নিজেই হেসে দমবন্ধ হবার উপক্রম করে, আমাদেরও প্রায় সেই দশা হ'ত। কিন্তু মজা এই যে, হাসির স্রোতে রাগটাগ সব কোথায় ভেসে যেত—মনটা আবার বেশ হাল্কা খুশীতে ভরে উঠত।'[৮]

১: সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'উপেন্দ্রকিশোর: শিল্পী ও কারিগর', "এক্ষণ" শারদীয় ১৩৯১, পৃ. ৫৩। ২: পুণ্যলতা ··, পৃ. ৯-১০। ৩: তদেব, পৃ. ১৫। ৪: তদেব পৃ. ২২। ৫: 'পাকদণ্ডী', পৃ. ১০০। ৬: পুণ্যলতা···, পৃ ৭০। ৭: তদেব, পৃ. ২০। ৮: তদেব পৃ. ৬৮।

৮

'আমরা ছিলাম শহরবাসী। কলকাতায় জন্ম কলকাতাতেই বাস। প্রতি বছর ছুটির সময় বাবা মায়ের সঙ্গে বেড়াতে যেতাম পাহাড়ে, পশ্চিমে কিংবা আমাদের দেশে।' পুণ্যলতার স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় উপেন্দ্রকিশোর প্রায় প্রতি বছর সপরিবারে বেড়াতে যেতেন। আত্মীয় পরিজন, বন্ধু-বান্ধব এবং তাঁদের পুত্র-কন্যারা মিলে বিরাট দল হত। সুকুমার ও তার ভাই-

বোনেদের কাছে এ ভ্রমণ ছিল, রীতিমতো আকর্ষণ ও উত্তেজনার বস্তু। সেকালের ভ্রমণার্থী ও বিশ্রাম-ভোগীদের প্রিয় জায়গাগুলিতেই তাঁরা বেশি বেড়াতে যেতেন ; যেমন : পচম্বা, মধুপুর, চুনার, দার্জিলিং কিম্বা পুরী। অনেক জায়গাতেই তাঁরা বেড়াতে গেছেন একাধিকবার। এছাড়া উপেন্দ্রকিশোরের জন্মভূমি ময়মনসিংহ তো আছেই। সুকুমারের চিত্ত-বিকাশে এসব ভ্রমণের ভূমিকা কম নয়। পুণ্যলতা পরিণত বয়সে এইসব ভ্রমণের স্মৃতি সযত্নে তুলে ধরেছেন তাঁর উৎসুক পাঠকদের কাছে :

'ট্রেনে, স্টিমারে, নৌকায়, অবশেষে হাতি এবং পাল্কিতে পূর্ব-বাংলায় আমাদের সেই গ্রামে যাওয়াটা আমাদের কাছে যেন একটা মস্ত অ্যাডভেঞ্চার ছিল।

রাত্রে শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেনে চড়ে সকালবেলায় গোয়ালন্দে স্টিমার ধরতাম। মস্তবড় জাহাজ, তাদের নাম এলিগেটর, ক্রোকোডাইল, পরপয়েজ, আবার একদল ছিল ঈগল্, কন্ডর, ভালচার। আমরা কেবিনের ভিতর থাকতে চাইতাম না...'

'দেশের ঘরবাড়ি, বাগান, পুকুর, আমাদের কাছে সে এক নতুন রাজ্য।'

'খুব ছোটবেলায় কত জায়গায় যাওয়া হয়েছিল মনে নেই, তবে পচম্বার কথা কিছু কিছু মনে পড়ে।...ফাঁকা মাঠের মধ্যে বাড়ি ছিল, রাত্রে চৌকিদার হাঁক দিয়ে যেতো, 'বা-বু-জাগল্ হো... ?" একেকদিন রাত্রে খুব চেঁচামেচি শুনতাম, "ভালু" "ভালু"। মহুয়া খেতে ভাল্লুক খুব ভালবাসে। সামনের মাঠের মধ্যে গাছে যখন মহুয়া পাকত, তখন তার লোভে ভাল্লুক এসে জুটত। লোকেরা মশাল নিয়ে ছুটত আর বিরাট হল্লা করে, টিন বাজিয়ে ভাল্লুক তাড়াত। আমরা ভয়ে লেপের মধ্যে আরও ঘেঁষাঘেঁষি করে শুতাম।'

'চুনারের কথা খুব মনে পড়ে। একেবারে গঙ্গার ওপরে সুন্দর মস্ত বাড়ি, ফুলবাগান, ফলবাগান, নদীর ধারে বসবার জন্য গোল গোল পাথরের বেদী, সুন্দর বাঁধান ঘাট, কিন্তু আমাদের প্রিয় জায়গা ছিল বেদীর পিছনে মস্ত বালির ঢিপি। সেখানে বালি খুঁড়ে ঘরবাড়ি পাহাড় বানাতাম, কত শামুক ঝিনুক বালির মধ্যে থেকে খুঁজে বার করতাম...।'

'চুনারে যেমন গঙ্গার উপরে ছিলাম, মধুপুরে তেমনি ছিলাম রেললাইনের উপরে। একেবারে বাড়ির পিছনের পাঁচিল ঘেঁষে ই. আই. আর লাইন ছিল, যতক্ষণ বাড়িতে থাকতাম ঐদিকে মন পড়ে থাকত। ভিতরের চওড়া বারান্দায় সকালে চা খাওয়া হ'ত, ঠিক সেই সময় পাশ দিয়ে হুস্ হুস্ করে মেইল ট্রেন চলে যেত।'

'সেবার পুরীতে গিয়ে আমরা প্রথম সমুদ্র দেখলাম। সকালে পুরী স্টেশনে পৌঁছবার অনেক আগেই দূর থেকে সেই নীল আকাশের গায় জগন্নাথের মন্দিরের উঁচু চূড়া দেখা গেল, ট্রেনের যাত্রীদল জয়ধ্বনি করে উঠল, "জয় জগন্নাথ"। "জয় জগন্নাথ"। ঝাউগাছের ফাঁকে ফাঁকে দূরে সমুদ্র দেখা গেল।'

'ঘুমের পরেই দার্জিলিং। স্টেশনে পৌঁছবার আগেই রাস্তার ধারে একটা বাড়ির গেটে দেখি সুবালামাসী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন, বুঝলাম এটাই আমাদের বাড়ি। ওঁদের বাড়ির পাশেই, ওঁরাই আমাদের জন্য বাড়ি ঠিক করে রেখেছিলেন।'[১]

এইসব ভ্রমণের কিছু কিছু তারিখ জানা যায়। উপেন্দ্রকিশোর সপরিবারে পচম্বায় গিয়েছিলেন সম্ভবত ১৮৯২ সালে। চুনারে ১৮৯৪-এ। ১৮৯৮-এর জুন মাসে তারা সপরিবারে মসুয়ায় এসেছেন। কলকাতায় তখন প্লেগের প্রকোপ চলেছে। ১৯০৪-এ সম্ভবত দ্বিতীয়বার সুকুমার ও তাঁর ভাইবোনেরা দার্জিলিং-এ এসেছেন। এই সময় তাঁরা থাকতেন ব্রাহ্মসমাজের একজন খ্যাত-নামা মানুষ ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের বাড়ি। গিরিডিতে এসে তাঁরা উঠতেন শিশু-সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ি 'লালকুঠি'তে, কখন গগনচন্দ্র হোমের বাড়ি 'হোমভিলায়'।[২]

মসুয়ায় দেশের বাড়িতে থাকার সময় ছোট্ট একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বালক সুকুমারের সাহস ও দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন পুণ্যলতা ঃ 'দিদি [সুখলতা] দাদা [সুকুমার] আর আমি বাইরের পুকুরের নির্জন বাঁধা ঘাটে বসে আছি, হঠাৎ কোথা থেকে প্রকাণ্ড লম্বা একটা লোক এসে হাজির। তার দুই হাত রক্তমাখা, হাতের লম্বা ছুরিটা থেকে টপ্ টপ্ করে রক্ত ঝরছে। দিদি আর আমি তো ভয়েই অস্থির, দাদা কিন্তু আমাদের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে লোকটার পথ আগলে দাঁড়াল। পরে অবশ্য জেনেছিলাম যে, লোকটা আমাদেরই বাড়িতে পাঁঠা কেটে পুকুরে হাত ধুতে এসেছিল, কিন্তু তখন তো আমরা তাকে ভীষণ দস্যু ডাকাত ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি নি। দাদার বয়স তখন ছয় বৎসরের বেশি হবে না, ছোট্ট দাদার সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলাম।'[৩]

১ ঃ পুণ্যলতার 'ছেলেবেলার দিনগুলি' থেকে। ২ ঃ উৎস ঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'সুকুমার রায় ঃ জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি', "এক্ষণ" কার্তিক সংখ্যা, ১৩৯৩। ৩ ঃ পুণ্যলতা, ...পৃ ৪১।

৯

'কবি মধুসূদনের পর বাংলার প্রধান ছন্দশিল্পী তিনজন—রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩) এবং সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৮২-১৯২২)। এই তিন ছন্দ শিল্পী কবির পরেই উল্লেখ করতে হয় কবি সুকুমার রায়ের (১৮৮৭-১৯২৩) নাম।'...'সুকুমার যেন ছন্দের পায়ে নূপুর পরিয়ে ও তার দুই হাতে মন্দিরা ধরিয়ে তাকে যেমন তালে তালে নাচিয়েছেন, তেমনি

নানা সুরে ঝংকৃতও করেছেন।'[১] এই উক্তি যে আশ্চর্যছন্দের কারিগর সম্বন্ধেঃ 'কবিতায় গল্প বলা' ইত্যাদি খেলায় পটুত্ব নিঃসন্দেহে তার শ্রেষ্ঠত্বের পূর্বাভাস।

খেলাটি এরকম ঃ একটি কোনো জানা গল্প নিয়ে একজন প্রথম লাইনটা বলবে, দ্বিতীয়জন পরের লাইনটা বলবে মিল বজায় রেখে। তৃতীয়জন আর একটা লাইন বলবে, চতুর্থজন সেটার সঙ্গে খাপ খায় এরকম একটা লাইন বলবে। সঙ্গে সঙ্গে গল্পও এগিয়ে চলবে পরিণতির দিকে। যদি কেউ না পারে সে হেরে গেল। 'খুব জমত এই খেলাটা। বাবা কাকারাও এতে যোগ দিতেন। দাদা [সুকুমার] কখন হার মানত না। যত শক্ত হোক না কেন চট্ করে মিলিয়ে দিত। যেমন একদিন হচ্ছে 'বাঘ ও বক-এর গল্প'···

"একদা এক বাঘের গলায় ফুটেছিল অস্থি"।
"যন্ত্রণায় কিছুতেই নাহি তার স্বস্তি"।
"তিনদিন তিন রাত নাহি তার নিদ্রা।"
"সেঁক দেয় তেল মাখে লাগায় হরিদ্রা।"—

এইরকম চলতে চলতে সুন্দর কাকা [মুক্তিদারঞ্জন] যেই বললেন—

"ভিতরে ঢুকায়ে দিল দীর্ঘ তাব চঞ্চু।"

কেউ আর মিল দিতে পারে না। আমরা সবাই "পাস" দিয়ে দিলাম, দাদার পালা আসতেই সে চট্ করে বলল—

"বক সে চালাক অতি চিকিৎসক চুঞ্চু"

আমরা চেঁচামেচি করে উঠলাম "ও সব যাতা বললে হবে না। 'চুঞ্চু' আবার কি কথা ?" সুন্দর কাকা খুশী হয়ে দাদার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'চুঞ্চু' মানে ওস্তাদ, এক্সপার্ট।'[২]

মাত্র আট বছর বয়সে সুকুমারের কাব্য-চর্চার প্রথম ফসল 'নদী' কবিতা প্রকাশিত হয় শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল' পত্রিকায়। ১৩০২ সনে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'নদী' নামক যুক্তাক্ষর বর্জিতদীর্ঘ কবিতাটির সঙ্গে নিঃসন্দেহে সুকুমারের পরিচয় ছিল। পরিচয় থাকা খুবেই স্বাভাবিক কারণ 'বাল্যগ্রন্থা-বলী'র অন্তর্গত'নদী' কাব্যগ্রন্থটিকে চিত্রিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অবনীন্দ্র নাথ ও উপেন্দ্রকিশোর। উপেন্দ্রকিশোর কাব্যটির জন্য মোট সাতটি ছবি এঁকে-ছিলেন। 'নদী'র যাত্রাপথের বাঁকে বাঁকে উদ্ঘাটিত মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যকে তুলি-কলমে আশ্চর্য দক্ষতায় ফুটিয়েতুলেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। বালক-কবির কল্পনায় সেই সচিত্র সচল নদী নিঃসন্দেহে স্বপ্নলোকের ছবি এঁকেছিল ঃ

হে পর্ব্বত যত নদী করি নিরীক্ষণ,
তোমাতেই করে তারা জনম গ্রহণ।
ছোট বড় ঢেউ সব তাদের উপরে,
কলকল শব্দ করি সদা ক্রীড়া করে,

তাই নদী বেঁকে চুরে যায় দেশে দেশে,
সাগরেতে পড়ে গিয়া সকলের শেষে।
পথে যেতে নদী দেখে কত শোভা,
কি সুন্দর সেইসব কিবা মনোলোভা।
কোথাও কোকিল দেখে বসি সাথী সনে,
কি সুন্দর কুহু গায় নিজ মনে।
... ...

ঠিক এর পরের বছর 'মুকুল' জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪ সংখ্যায় সুকুমারের কাব্যচর্চার দ্বিতীয় ফসল 'টিক্ টিক্ টং' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। উল্লেখ না থাকলেও কবিতাটি সুপরিচিত Nursury Rhyme 'Hickory Dickory Dock'-এর ভাবানুবাদ।

উপেন্দ্রকিশোর ছন্দে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনিয়েছেন অতি সরল ও সুললিত যুক্তাক্ষর বর্জিত ভাষায় অতি নবীন পাঠকদের কথা মনে রেখে। উপেন্দ্রকিশোরের পিতা কালীনাথ সংস্কৃতে স্বরচিত স্তোত্র-কবিতা রচনা করে পূজা-পাঠ করতেন একথা জানিয়েছেন স্বয়ং সুকুমারই।[৩] এছাড়া তাঁদের বংশে আর একজন স্বভাবকবির ছন্দোচর্চার কথা জানা যায়। তিনি হলেন উপেন্দ্র-কিশোরের পিতামহ লোকনাথ রায়ের ভাই ভোলানাথ রায়। মনসামঙ্গল বা ভাসান গানের আসরে তাঁর ডাক পড়ত। মুখে মুখে তাৎক্ষণিক ছড়া বানাতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়ঃ 'হরিকিশোরের পিতা গঙ্গাধর রায় তখন পশ্চিমের বাড়ির কর্তা। গঙ্গাধর রায়ের বাড়ির সামনে একটা বিরাট দিঘি—এখনও সেটা আছে। সেই দীঘিতে একটা বাঁধানো ঘাট ছিল। একদিন ঐ পুকুরে স্নান করে ভোলানাথ রায় বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন, হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যান—সঙ্গে সঙ্গে কবিতা বানানঃ—

গঙ্গাধর রায়ের পুষ্করিণী
চতুর্দিকে ডঙ্কা শুনি।
শ্যাওলা পাতার বর্ণ জল
ব্যাঙে করে কলকল।
যাও একটা বান্দা ঘাট
উঠতে লাগে মার্গ ফাট।'[৪]

'একবার ভোলানাথ খাজনা করতে গেছেন কিন্তু নায়েব মশাই গায়ে তেল মাখছেন তো মাখছেনই। ভোলানাথ বললেন,

'আমি আইলাম খাজনা করতাম
নায়েব লাগাইল তেল।
আশা উমেদ যত আছিল মার্গের তলে গেল।'[৫]

এগুলি 'বাঙাল দেশের ভাষায় বলা, এমন কিছু উঁচুদরের কবিতা নয়'[৬]—

নিঃসন্দেহে, কিন্তু পূর্বপুরুষের মধ্যে হয়ত এভাবেই থেকে যায় ভাবীকালে পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত উত্তর-পুরুষের উপস্থিতি।

১ঃ প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ছন্দশিল্পী সুকুমার রায়', "দেশ", ৬. ৯. ৮৬ সংখ্যা, পৃ. ২৭, ৩১। ২ঃ পুণ্যলতা…, পৃ. ৬৯। ৩ঃ 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র', ৩য় খণ্ড, সম্পা. সত্যজিৎ রায়, পৃ. ৭৭। ৪ঃ হিতেন্দ্রকিশোর…, পৃ. ৪২, ৪৩। ৫ঃ লীলা…, 'উপেন্দ্রকিশোর' পৃ. ৬৫। ৬: তদেব।

১০

পাঁচ বছর বয়সে সুকুমারের প্রাথমিক শিক্ষার শুরু 'ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়'-এ। বারো বছর বয়স অবধি ছেলেরাও এখানে পড়তে পারত।

স্কুলটি ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতেই: 'বাড়ির মধ্যেই স্কুল। · এ দরজা দিয়ে বেরিয়ে ও দরজা দিয়ে ঢুকলেই হল।…এক তলায় স্কুল, দোতলায় বোর্ডিং ছিল। ছোটোদের ক্লাস হত পূজার দালানে।'[১]

'ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়'—সেকালে নতুন ধরনের সেরা মানের স্কুল। এর পরিকল্পনা মূলত শিবনাথ শাস্ত্রীর: 'ব্রাহ্ম পাড়ায় ছোট ছেলেমেয়েদিগকে সর্বদা সমাজের মাঠে খেলিতে দেখিয়া মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, ইহাদিগকে বেথুন স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া এদের জন্য একটি ছোটো স্কুল করা যাক্। স্কুলটী তিন ঘণ্টা বসিবে, এবং কিণ্ডারগার্টেনের অনুরূপ প্রণালীতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই ভাবিয়া প্রথমে কতকগুলি শিশু সংগ্রহ করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করা গেল। স্কুলটিতে বালিকাই অধিক জুটিল, সঙ্গে শিশু বালকও থাকিত। নাম রাখা গেলে 'ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়।'[২] সুকুমারের জন্মের বছর তিনেক আগে এর প্রতিষ্ঠা। সুকুমার ও তাঁর ভাই-বোনেদের প্রাথমিক শিক্ষা এই স্কুলেই। দ্বারকানাথের ছেলেমেয়েরাও পড়েছেন এই স্কুলে। পরবর্তীকালে নানা ক্ষেত্রে যশ অর্জন করেছেন এমন অনেকেই এ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। যেমন: দ্বারকানাথের পুত্র খ্যাতনামা সাংবাদিক ও লেখক প্রভাতচন্দ্র (জংলী গাঙ্গুলী ১৮৮৯-১৯৭৩), দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৩৩) খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের এক সময়ের অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রমোহন বসু (১৮৮৫-১৯৭৫)—প্রমুখ।

১৮৮৮ খ্রি.-এ ইংলণ্ডে কিণ্ডারগার্টেন স্কুল দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। এই স্কুলেও সেই ধারায় চিত্তবিনোদন ও চিত্তবিনোদনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই স্কুলে গান শেখানো হত, কখনো বিদেশিনী শিক্ষয়িত্রী এসে ছড়ার সঙ্গে খেলা শিখিয়ে যেতেন; আবার ছাত্র-ছাত্রীরা বয়স্কদের তত্ত্বাবধানে দল বেঁধে যেত চিড়িয়াখানায়,

বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি জায়গায়। কোনো জায়গায় হত পিকনিক, পঙ্‌ক্তি ভোজন।

রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের ক্লাসও হত এই বাড়িতে, নীতি-শিক্ষার সঙ্গে গান শেখানোর একসময়ে দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং উপেন্দ্রকিশোর। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় মনে হত সে ক্লাস। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়ঃ 'রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়ে'র ঐ গানের ক্লাস এমনি আনন্দের ব্যাপার ছিল যে, যদিও আমি তখন পিতার [রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়] কর্মস্থল এলাহাবাদ হইতে ছুটিছাটায় শুধু কলিকাতায় আসিতে পাইতাম, কিন্তু সেই ছুটির মধ্যে অতি আগ্রহের সহিত সেই ক্লাসে যাইতাম—সামান্য কয়দিন আনন্দলাভের জন্য। বাল্য জীবনে সংগীতের কি প্রভাব···উপেন্দ্রকিশোর তাহা জানিতেন বলিয়াই তাঁহার শত কাজের মধ্যেও এই গানের ক্লাস চালানোর ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।'[৩]

নীতিশিক্ষার ক্লাসেরও কম আকর্ষণ ছিল না সুকুমার ও তাঁর ভাইবোনের কাছেঃ 'একজন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন যেমন ফর্সা ও লম্বা-চওড়া, তেমনি কড়া ছিল তাঁর শাসন। কিন্তু গল্প বলতে যখন বসতেন, তখন তিনি যেন একেবারে অন্য মানুষ! "নীতি-শিক্ষার" ক্লাসে কি সুন্দর করে যে নানা গল্প কবিতা আর জীবন চরিতের মধ্যে দিয়ে আমাদের নীতিকথা শোনাতেন, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম - ক্লাস করছি বলে মনেই হ'ত না।'[৪]

উপেন্দ্রকিশোরও স্বয়ং ছেলেমেয়েদের অনেক কিছু শেখাতেন; সুকুমার বা তাঁর ভাইবোনের কাছে সেটাই সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হতঃ 'স্কুলে লেখাপড়া করতাম, বাড়িতে মাস্টার মশায়ের কাছে পড়তাম, কিন্তু বাবার কাছে গল্পের মতো করে মুখে মুখে কত কি শিখতাম, সেটাই সবচেয়ে ভাল লাগত। সহজ বিজ্ঞানের কথা, পৃথিবীর জন্ম-কথা, চাঁদ-সূর্য গ্রহ নক্ষত্রের কথা, এমনি কত কি।' 'এমন সহজ আর সুন্দর করে বাবা বলতেন যে, কত সময়ে একজিবিশন কিংবা মেলায় গিয়ে দেখেছি, আমরা যেখানে যাচ্ছি, আমাদের ঘিরে একটা ছোটো খাটো ভীড় জমা হয়ে যাচ্ছে। বাবা আমাদের সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন, চারদিক থেকে লোকে ঝুঁকে পড়ে হাঁ করে তাই শুনছে।'[৫]

১ঃ পুণ্যলতা··, পৃ. ২৩। ২ঃ শিবনাথ শাস্ত্রী, 'আত্মজীবনী', প্রবাসী সং., ১৩২৮, পৃ. ৪৪৫। ৩ঃ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'উপেন্দ্রকিশোর', "বিশ্বভারতী পত্রিকা", কার্তিক-পৌষ, ১৩৭১, পৃ. ১১২। ৪ঃ পুণ্যলতা ··, পৃ. ২৪। ৫ঃ তদেব, পৃ. ৬৩।

১১

১৮৯৫ সাল নাগাদ ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে উপেন্দ্রকিশোর সপরিবারে চলে আসেন কাছাকাছি ৩৮/১ শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়িতে।[১] 'ইউ. রায়, আর্টিস্ট'—এই নাম দিয়ে ব্যবসা শুরু এই বাড়িতেই[২]ঃ

'মাঝারি রকমের বাড়ি, তার মধ্যে একটা ঘরে বাবা [উপেন্দ্রকিশোর] স্টুডিও তৈরী করলেন, আরেকটা ঘরে ছোট একটা ছাপার প্রেস বসল, অন্য একটা ঘরে ও বড় বারান্দায় নানারকম যন্ত্রপাতি রাখা হল। একটা স্নানের ঘরকে করা হল ডার্করুম।'[৩]

এখান থেকেই ন' বছর বয়সে সুকুমার ভর্তি হলেন সিটি কলেজিয়েট স্কুলে। অতিক্রান্ত শতবর্ষ সিটি স্কুলের তখন প্রারম্ভিক যুগ। সুকুমারের জন্মের আটবছর আগে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় এটি হাইস্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্রাহ্মসমাজ পরিমণ্ডল থেকে অনতিদূরে ১৩ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এফ. এ. এবং ১৮৮৪ খ্রি.-এ বি. এ. পড়ানোব ব্যবস্থা হয়েছে এর সংশ্লিষ্ট কলেজে।

সুকুমাবের ছাত্রাবস্থায় সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রজনীকান্ত গুহ, অম্বিকাচরণ মিত্র, কালীশঙ্কর সুকুল, সতীশচন্দ্র রায় প্রমুখ এখানে এক সময়ে পড়িয়েছেন। সুকুমার যখন এফ. এ. পড়ছেন তখন এই কলেজে বিভিন্ন বিভাগে যাঁরা পড়াতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ। এই হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বনামধন্য 'হরেন মুখার্জি' যিনি পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়েছিলেন।[৪] প্রারম্ভিক যুগে এই স্কুলের ছাত্রদের দুরন্তপনার অনেক কাহিনী শোনা গেলেও পরে যথেষ্ট সুনাম ছিল এই বিদ্যায়তনের।

সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু' ইত্যাদি 'স্কুল স্টোরি'তে সুনিশ্চিতভাবেই তাঁর ছাত্র-জীবনের অনেক ঘটনার ছায়া পড়েছে—অন্তত সন্দেশের সুকুমারমতি পাঠকদের জন্য লেখা হাসির গল্পে পারিপার্শ্বিকতার যতটা ছায়া পড়া সম্ভব। সুকুমার স্কুলের গল্পে ধরে রেখেছেন সেইসব ছেলেদের যারা হয়ত তথাকথিত ভালো ছেলে নয়; কিন্তু যারা সবকালে সমান। যাদের অরিজিন্যালিটি এবং বিচিত্র দুরন্তপনার উদ্ভাবনী বুদ্ধিকে সমীহ না করে উপায় নেই।

এ যুগের দু'একটি ঘটনা থেকে ভবিষ্যতের চিন্তায় ও কর্মে অটল, তরুণ ব্রাহ্ম যুবগোষ্ঠীর দৃঢ়চিত্ত স্বাভাবিক নেতাকে বেশ চেনা যায়ঃ 'দাদার [সুকুমার] আর মণির [সুবিনয় রায়] নতুন স্কুলে অনেক বন্ধু জুটে গেল। দুজনেই পড়াশুনোয় ভাল আর শিক্ষক ও ছাত্র—সকলেরই প্রিয় ছিল। ছোটবেলা থেকেই দাদা যেমন আমাদের খেলাধুলো সব কিছুরই পাণ্ডা ছিল, তেমনি বন্ধু-বান্ধব আর সহপাঠিদের মধ্যেও সে সর্দার হল। সর্দারি করা মোটেই তার স্বভাব ছিল না, কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল যার জন্য সকলেই তাকে বেশ মানত। দলের সকলে নিজে থেকে যেন তাকে নেতা বলে মেনে নিয়েছিল।

তাকে সবাই ভালবাসত, প্রাণ খুলে তার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করত, কিন্তু তার সামনে দুষ্টুমি করতে সাহস পেত না। বড়রাও তার কথাব বেশ মূল্য দিতেন।

দাদাদের স্কুলে একজন টিচার ছিলেন, খুব ভাল তবে একটু কড়া 'পিউরি-ট্যান' গোছের মানুষ। সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। একদিন ক্লাসে তিনি ছেলেদের বায়োস্কোপ দেখার অনিষ্টকারিতার বিষয়ে অনেক কথা বললেন··· দাদা উঠে বলল যে, তারও মনে হয় বায়োস্কোপ বেশী দেখলে কিংবা বাজে বাজে ছবি দেখলে অনিষ্ট হয় তবে ভাল ছবিও অনেক আছে, সেগুলি মাঝে মাঝে দেখলে তাতে বরং উপকারই হয়। শিক্ষক মশাই যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। তিনি হয়তো আশা করেছিলেন যে, দাদা বায়োস্কোপ দেখার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই বলবে। ক্লাসের পরে দাদা তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "স্যার, আপনি কি কখনও বায়োস্কোপ দেখেছেন ?" তিনি বললেন, "না, আমি ওসব দেখি না"। দাদা বলল, "আমি আপনাকে একটা ভাল ছবি দেখাতে চাই, আমার সঙ্গে যাবেন কি ?" খানিক ইতস্তত করে তিনি রাজী হলেন। তারপর দাদা তাঁকে একটা ভাল ছবি (যতদূর মনে পড়ে 'লে মিজারেবল') দেখিয়ে আনল। সেই ছবি দেখে তিনি দাদাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, 'তুমি আমার মস্ত ভুল ভাঙ্গিয়ে দিলে। বায়োস্কোপের ছবি যে এত ভাল হয়, সে ধারণা আমার ছিল না।'

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন পুণ্যলতা, যা থেকে সুকুমারের কোমলে-কঠোরে মেশানো প্রবল নৈতিক-শক্তিই বেশি করে চোখে পড়ে : 'আমাদের একজন আত্মীয় মাঝে মাঝে দেশ থেকে এসে আমাদের বাড়িতে থাকতেন। ডিসপেপটিক মানুষ, মেজাজ ভারি চটা। আমরা ভয়ে ভয়ে তাঁর থেকে একটু দূরেই থাকতাম, সহজে কাছে ঘেঁষতাম না। একবার তিনি দেশে ফিরবার সময় একটা মাগুর মাছ নিয়ে যাচ্ছেন, পথে মাছের ঝোল ভাত খাবেন। চাকরকে দিয়ে ছোট্ট টিনের মধ্যে মাছটাকে বেশ করে কর্ক-স্ক্রুর মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঢোকাচ্ছেন, দাদা দেখতে পেয়ে বলল, "অতটুকু টিনের মধ্যে মাছটা কি করে আঁটবে ? একটা বড় টিন নিলে হত না ?"

তিনি ধমকিয়ে উঠলেন, "আবার কত বড় টিন নেব ? এতখানি রাস্তা, এতবার ওঠানামা, কত হাঙ্গামা !"

"তা বলে অতখানি রাস্তা ওটাকে টর্চার করতে করতে নিয়ে যাবেন ?"

আর যায় কোথায় ! ভীষণ রেগে চিৎকার করতে আরম্ভ করলেন, "নিজেরা মাছ মেরে খাও না ? আমার বেলায় যে বড় বলতে এসেছ ?"

দাদার কিন্তু ধীরভাবে ঐ এক কথা : "মেরেই তো খাবেন, কিন্তু অমন করে টর্চার করবেন না।" শেষ পর্যন্ত তিনি বড় একটা টিন নিলেন, তবে দাদা সেখান থেকে নড়ল।'[৫]

হারিয়ে যাওয়া যুগের ইতিহাস সন্ধান করলে সিটি স্কুলে সুকুমারের দু'-একজন সহপাঠীর নামও জানা যায়। ১৮৯৭ সালে সুকুমার যখন ওই স্কুলে ফিফ্‌থ্‌ ক্লাসের ছাত্র সেই সময় তার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন সুধীরকুমার সেন (১৮৮৮-১৯৫৯) ও মণিমোহন সেন[৬] (১৮৮৫/৮৬-১৯৭৭)। সুধীর কুমার সেন চণ্ডীচরণ সেনের পুত্র ও কবি কামিনী রায়ের ভাই। সেন র‍্যালে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা সুধীরকুমার উদ্যোগী বাঙালী ব্যবসায়ী হিসেবে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মেট্রোপলিটান কলেজের (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ইংরাজি ও অর্থনীতির অধ্যাপক মণিমোহন সেন অর্থ-পুস্তক রচয়িতা এম. সেন হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিলেন।[৭]

এই সিটি স্কুল থেকে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে এণ্ট্রান্স পাস করেন সুকুমার; এরই সংশ্লিষ্ট কলেজ থেকে এফ. এ. পাস করেন দ্বিতীয় বিভাগে, ১৯০৪-এ।[৮]

এফ. এ.-তে 'optional' হিসেবে ১০০ নম্বরের একটি পত্রেও ('Original Composition in Bengali') সুকুমার পাস করেছিলেন।[৯] এই পত্রে ৫০ নম্বরের মোট দুটি রচনা থাকত। পাস নম্বর ছিল ৪৫। শতকরা ৫০ নম্বর পেলে পরীক্ষার্থী একটি 'special certificate' পেত।[১০] এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল সুকুমারের সময়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পত্রটির প্রশ্নকর্তা ছিলেন। পরীক্ষক ছিলেন মোট তিনজন: কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশ চন্দ্র সেন ও হারাণ চন্দ্র রক্ষিত।[১১] এফ. এ. পরীক্ষায় ফিজিক্সের প্রশ্নপত্র করে-ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং ডি. এন. মল্লিক। এই পত্রের 'Moderator' ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র।[১২]

সুকুমার যে বছর এফ. এ. পাস করেন, সেই বছর (অর্থাৎ ১৯০৪-এ) এই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রথম তিনজন হলেন: রাজেন্দ্রপ্রসাদ (পরবর্তী-কালে ভারতের রাষ্ট্রপতি), শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ঢাকা কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলেন) ও মণিমোহন সেন[১৩] (এঁনার কথা আগেই বলা হয়েছে, ইনি সিটি স্কুলে সুকুমারের সহপাঠী ছিলেন; এফ. এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন প্রেসি-ডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসেবে)।

১: ...'কলিকাতা-দর্পণ', পৃ. ৯৭। ২: ...'উপেন্দ্রকিশোর: শিল্পী ও কারিগর', পৃ. ৭১। ৩: পুণ্যলতা... পৃ. ৬০। ৪: C. U. Calendar: 1902, p. 31। ৫: পুণ্য-লতা...পৃ. ১৩১-১৩৩। ৬: মণি বাগচী, 'সুধীরকুমার সেন', ১৯৬৪, পৃ. ১৪। ৭: 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান', ১৯৭৬, পৃ. ৩৮৭। ৮: C. U. Calendar: 1905, p. 338: 'Ray Chaudhuri, Sukumar...City College, Calcutta'. ৯: Ibid: 'passed in original composition in Bengali'. ১০: Ibid, p. 178. ১১: Ibid, p. 166. ১২: Ibid, p. 165. ১৩: Ibid, p. 331.

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯০৪—১৯১১

প্রসঙ্গ ঃ

১ ঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ

২ ঃ ননসেন্স ক্লাব

৩ ঃ উপেন্দ্রকিশোর ও নরেন্দ্রকিশোরের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ

৪ ঃ স্বদেশি আন্দোলন ঃ উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার

৫ ঃ ভারতীয় চিত্রশিল্প বিতর্ক

৬ ঃ ব্রাহ্ম যুব সমিতি

১

১৯০৪-এ সিটি কলেজ থেকে এফ. এ. পাশ করার পর ওই বছরই সুকুমার ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসে বিশ শতকের প্রথম দশকটি নানাদিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর আত্মজীবনীতে এই সময়টিকে প্রেসিডেন্সি কলেজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগ আখ্যা দিয়েছেন। তিনিও এই সময়ে বি. এ. ক্লাসের ছাত্র (১৯০২-১৯০৭)। এই সময় প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার রায়ের (পি. কে. রায়) উদ্যোগে ছাত্রদের মধ্যে সম্প্রীতি ও একতার জন্যে 'কলেজ-ইউনিয়ন' তৈরি হয়েছে। নিয়মকানুন তৈরি করেছেন অধ্যক্ষ পি. কে. রায় স্বয়ং। রাজেন্দ্রপ্রসাদ হয়েছেন এই ইউনিয়নের সেক্রেটারি। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ছাত্ররা প্রথম কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছে (হাতে লেখা, মুদ্রিত পত্রিকা বেরোয় ১৯১৪ খ্রি.-এ)। বিতর্ক প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা, শরীরচর্চার ব্যবস্থা হয়েছে এই সময়। সুকুমার যে বছর এখান থেকে পাশ করে বেরোন (অর্থাৎ ১৯০৭ সালে) সেইবছরই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা ক্রিকেটের দুর্ধর্ষ টিম ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবকে এক উইকেটে হারিয়ে দেয়। এটা ছিল সেকালের ক্রীড়াজগতের একটি স্মরণীয় ঘটনা। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত একই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। ভালো ক্রিকেট-খেলোয়াড় হিসেবে যতীন্দ্রমোহনের নাম প্রায়শই শোনা যেত। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় মোটামুটি সুকুমার রায়ের সমকালেই ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়েরও ছাত্র ছিলেন যতীন্দ্রমোহন)। পরবর্তীকালের বিখ্যাত অনেক ব্যক্তি, যেমন বিনয়কুমার সরকার, দেবেন্দ্রমোহন বসু, গিরীন্দ্রশেখর বসু, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ, মোটামুটি এই সময়েই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র।

১৯০৪-০৭ এর মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, M. G. D. Prothero, প্রসন্নকুমার রায়, Alexandar MacdoNnell, Charles Little, H. R. James. সুকুমার অনার্স নিয়েছিলেন দুটিতে—রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যায়। সে সময়ে রসায়নে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপকদের মধ্যে পেয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে। এছাড়া ছিলেন H. E. Stapleton, J. A. Cunnig-ham, চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী, গোপিকাভূষণ সেন, মন্মথ রায়, নিত্যগোপাল পাল, বিধুভূষণ দত্ত, অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—প্রমুখ। পদার্থবিদ্যায় সে সময়ে পড়াতেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বরদাপ্রসাদ ঘোষ,

হৃদয়চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, জগদিন্দু রায়, J. W. Kuchler, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, V. H. Jackson, দ্বিজেন্দ্রকুমার মজুমদার—প্রমুখ।[১] আচার্য জগদীশ চন্দ্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এঁরা একদিক থেকে সুকুমারের পিতৃবন্ধু। এঁরা মাঝে মাঝে আসতেন উপেন্দ্রকিশোরের কাছে।[২]

সুকুমার ওই দুটি বিষয়ে অনার্স নিয়ে বি. এস-সি পাশ করেন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। পদার্থবিদ্যায় সে বছর উত্তীর্ণ হয়েছিলেন মাত্র দু'জন। প্রথম বিভাগ পেয়েছিলেন সতীশচন্দ্র মজুমদার। দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন একমাত্র সুকুমারই। রসায়নে সে বছর প্রথম বিভাগ কেউই পান নি। দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন সুকুমার রায় ও জনৈক নগেন্দ্রচন্দ্র দাস।[৩] [সতীশচন্দ্র মজুমদার পরে গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির বি. এস-সি পরীক্ষায় (ইঞ্জিনীয়ারিং) প্রথম হয়েছিলেন। নগেন্দ্রচন্দ্র পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে নিজগ্রাম দুর্গাপুরে উচ্চবিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন।[৪] এঁরা দুজনেই ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র।

প্রেসিডেন্সি কলেজ সংক্রান্ত বিবরণী থেকে সুকুমারের একটি কৃতিত্বের কথা জানা যায়; তা হ'ল সুকুমার ১৯০৭ সালে অর্থাৎ যে বছর পাশ করেন সেই বছরে রায় বাহাদুর অমৃতনাথ মিত্র প্রাইজ ("Best Hindu in Combined Physical Science and Chemistry") পেয়েছিলেন।[৫]

১ঃ সূত্রঃ Presidency College ; 'Centenary Volume' ; 1956 **২ঃ পুণ্যলতা··'** পৃ. ১১০,১১১ **৩ঃ** C. U. Calendar, 1911, Page: 494 **৪ঃ** 'Presidency College Register', 1927, p. 191, 231. **৫ঃ** '...Centenary Volume' p. 144.

২

স্কুল ছাড়ার কিছুকাল আগেই সুকুমাররা চলে এসেছেন ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে। ততদিনে উপেন্দ্রকিশোরের প্রেসের ও ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ-কর্মও অনেক বেড়েছে, ফলে জায়গার দরকার ছিল বেশি। এই বাড়ির একাংশ ভাড়া নিলেন উপেন্দ্রকিশোরঃ 'সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ির একতলার সামনের (উত্তরের) অংশে অফিস, প্রেস, ছবি বানাবার নানারকম ওষুধ বা রাসায়নিক জিনিস এইসব ছিল। একতলার মাঝখানে একটা উঠোন ছিল ; তার পশ্চিম ধারে ফটোগ্রাফির একটা ডার্করুম, আর উপরে যাবার সিঁড়ি। পেছনের (দক্ষিণের) অংশে খাবার ঘর, চাকরদের থাকবার ঘর, রান্নাঘর, উঠোন, স্নানের ঘর এইসব ছিল ; দোতলায় উঠবার একটা ঘোরানো-ঘোরানো লোহার সিঁড়িও ছিল। দোতলায় সকলে থাকতাম। সামনের দুটো ঘরের দেয়ালে বাবা [উপেন্দ্রকিশোর] অনেকটা ফুল, লতা-পাতার মতন নানারকম চিত্র এঁকে ঘর

দুটোকে বড় সুন্দর করে দিয়েছিলেন। দোতলার পেছনের পশ্চিম ধারে একটা ছোট ছাত ছিল। তেতলার ছাতের মাঝখানে একটা ঘর ছিল। ছাতের উত্তর ভাগে কাঁচের ছাতওয়ালা একটা সুন্দর স্টুডিও ছিল। বেশী মেঘলা দিনে আর রাত্রে ছবির কাজ চালাবার জন্য আর্ক ল্যাম্প আনা হয়েছিল।'[১] এই বাড়ির পূর্ব অংশে একতলায় ছিল 'কান্তিক প্রেস' ও দোতলার একাংশে ছিল 'ভারতী' পত্রিকার অফিস ও বৈঠক।[২]

এই বাড়িতেই পত্তন হয় ননসেন্স ক্লাবের। রায় পরিবারের লোকজন ও নিকট আত্মীয়দের নিয়েই ঘরোয়াভাবে সম্ভবত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালে ননসেন্স ক্লাবের সূচনা।

নাচ গান অভিনয় এই ক্লাবের প্রধান আকর্ষণ। সুকুমার এ সবের প্রধান উদ্যোক্তা ও পরিচালক। তাঁর দুটি বিখ্যাত নাটিকা 'ঝালাপালা' আর 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ননসেন্স ক্লাবের জন্যই লেখা। সুকুমারের হারিয়ে যাওয়া নাটক 'রামধন বধ' সম্ভবত এ দুটি নাটকের আগে একেবারে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব গোড়ার দিকে লেখা। সম্ভবত 'ভাবুক সভা' বা 'শব্দকল্পদ্রুমে'র পরিকল্পনাও এই ননসেন্স ক্লাবের যুগে। এই আসরের একটি হাতে লেখা পত্রিকা ছিল নাম 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'। সুকুমারই সম্পাদক এবং প্রধান লেখক, যদিও অন্য সভ্যদের লেখাও প্রকাশিত হত, তবে সেগুলি ছদ্মনামে। পুণ্যলতা লিখছেন ঃ 'এখন যেমন রাস্তায় রাস্তায় শোনা যায় 'চানাচুর গরম', আমরা ছেলেবেলায় শুনতাম 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা', বত্রিশ রকমের ভাজাভুজি এবং মসলা নাকি তার মধ্যে থাকত, তার ওপর আধখানা ভাজা লংকা বসানো, তাই সাড়ে-বত্রিশ। কাগজের সম্পাদক দাদা, মলাট ও মজার মজার ছবিগুলি সব দাদার আঁকা, অধিকাংশ লেখাও দাদারই। অন্যদের লেখাও থাকত, হাসির কথা ছাড়াও গম্ভীর বিষয়ে লেখাও থাকত, কিন্তু দাদার লেখাই ছিল তার প্রাণ বিশেষ করে পঞ্চতিক্ত পাঁচন নামে সম্পাদকের পাঁচ মিশালী আলোচনার পাতাটি বড়রাও আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন, 'পঞ্চতিক্ত' নাম হলেও সেটা কিন্তু মোটেই তেতো ছিল না, বরং খুব মুখরোচক ছিল।'

পত্রিকাটিতে লেখা ছাড়া আজগুবি বিজ্ঞাপনও থাকত—প্রধানত সুকুমারেরই লেখা। যেমন ঃ

"বিজ্ঞাপন"

আমাদের গন্ধ বিকট তৈলের নাম আপনি অবশ্যই শুনিয়াছেন। অ্যাঁ? শোনেন নি? আমরা একমাস ধরে চেঁচিয়ে কেরাসিনের টিন বাজিয়ে তেলের বিজ্ঞাপন দিয়ে হয়রান হয়ে গেলাম, আর আপনি একদম শুনলেন না। তবে শুনুন।

এই তেল ঘরে রাখলে, তেলের গন্ধে মশা, ছারপোকা, উকুন, আরশুলা সব মরে যাবে। চোর, ডাকাত, পাগলা কুকুর এ সব ঘরে প্রবেশ করবে না। মানুষ

তো দূরের কথা, ভূত পেত্নী পর্যন্ত পুঁটলী নিয়ে বাপ্‌ বাপ্‌ বলে দৌড়ে পালাবে।'[৩]

এই ক্লাবকে কেন্দ্র করেই সুকুমারের অভিনয় প্রতিভার বিকাশ। পরবর্তীকালে সুকুমার রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্র-নাটকে অভিনয় করেছেন। 'বিচিত্রা' ক্লাবে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকে কেদারের ভূমিকায় 'সুকুমারবাবুর বিকট মুখভঙ্গী আজো ভুলিতে পারি নাই' বলে লিখেছেন সীতাদেবী।[৪] শান্তিনিকেতনে বা জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ক্লাবে রবীন্দ্রনাথ ও অনেক গণ্যমান্যের উপস্থিতিতে একসময়ে সদলবলে স্বরচিত 'অদ্ভুত রামায়ণ' --গান, অভিনয় ও কথকতা করে শুনিয়ে সকলকে আনন্দ দিয়েছেন সুকুমার। ননসেন্স ক্লাবের যুগেই এই প্রতিভার বিকাশ। 'বাঁধা স্টেজ নেই, সীন সাজ-সজ্জা ও মেকআপ বিশেষ কিছুই নেই, শুধু কথায়, সুরে ভাবে সঙ্গীতেই তাদের অভিনয়ে বাহাদুরি ফুটে উঠত।'[৫]

এই ক্লাবের একসময়ের সভ্য দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র প্রভাতচন্দ্র কিছু বিচিত্র তথ্য জানিয়েছেন: 'ক্লাবের প্রতিটি সদস্যদেরই এক একটি উদ্ভট নাম ছিল এবং সেগুলির উদ্ভবকর্তা স্বয়ং সুকুমার। ...যথা: "জঙ্গল্লা মাসোরাব গ্যোছ্যো", "জাপানমণি সাবান খোর"[৬], "স্লাই ফক্স মেটেহেন" "মাখনলাল ভজুয়া" প্রভৃতি। ...নামকরণের পশ্চাতে জানিত এমন সব কারণ বর্তমান ছিল যে সকলেই নামগুলিকে সুপ্রযুক্ত মনে করিত।...'

'এই ক্লাবের আর একটা স্মরণীয় ঘটনা হইল জাপান কর্তৃক পোর্ট আর্থার জয়ের পর শক্তিধর পাশ্চাত্য রাষ্ট্র রাশিয়ার প্রাচ্যের এক ক্ষুদ্র জাতি জাপানের নিকট পরাজয় এশিয়ার নবদ্যোতক জ্ঞানে ক্লাবের সদস্যবর্গ উৎসাহের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির ষ্ট্রীটের সমবায় বিল্ডিংসে তৎকালে স্থিত হোটেলে পোর্ট আর্থার ডিনার দ্বারা উৎসব সম্পাদন।' প্রভাত গাঙ্গুলী আরও জানিয়েছেন: "বিলাতী ননসেন্স রাইম"-এর অনুসরণ করিয়া কবিতা রচনার আরম্ভ এই সাড়ে বত্রিশ ভাজায়।"[৭] অর্থাৎ সুকুমারের ননসেন্স-প্রতিভার বিকাশ এই ক্লাবের মুখপত্রটিকে কেন্দ্র করে।

সুকুমারের বিলাত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই ক্লাবের আয়ুষ্কাল। এ ছাড়া 'কয়েকজন সদস্য কার্যব্যপদেশে কলিকাতা ত্যাগ' এবং 'কতিপয় সদস্যের অকাল মৃত্যু'র[৮] কারণকেও এর সঙ্গে যুক্ত করা যায়। সম্ভবত সুকুমারের সমবয়সী মাতুল, ক্লাবের উৎসাহী সদস্য প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে এই সময়েই।

১: সুবিমল রায়, 'উপেন্দ্রকিশোর রায়ের কথা', "সন্দেশ", বৈশাখ, ১৩৭০, পৃ. ৩০। ২: 'কলিকাতা দর্পণ', পৃ. ১০০। ৩: অজিত কুমার দত্ত, 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' গ্রন্থে সংগৃহীত। ৪: সীতাদেবী, 'পুণ্যস্মৃতি', পৃ. ১২৪। ৫: পুণ্যলতা..., পৃ. ১৪২। ৬: নামটি সম্ভবত সুকুমারের পরের ভাই সুবিনয়কে (মণি) লক্ষ্য করে রাখা। সুবিনয় সে সময়ে

প্রায়ই সাবান কারখানা খোলার কথা বলতেন। সে সময়ে কয়েকজন জাপানী সাবান-বিশেষজ্ঞ হিসেবে এদেশে এসেছিলেন। এঁদেরই একজন ঢাকার বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরির কর্মী ওয়েমন তাকেদার সঙ্গে ঢাকা নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের কর্মী শশিভূষণ মল্লিকের কন্যা হরিপ্রভার বিবাহ হয়। সুবিনয় এই সময় বয়োধর্ম অনুসারে ছিলেন জাপানের গুণগ্রাহী। ৭ঃ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'আমাদের মানডে ক্লাব', "যুগান্তর", ১৪ জুলাই ১৯৬৩। ৮ঃ তদেব।

৩

হরিকিশোর যখন কামদারঞ্জনকে (উপেন্দ্রকিশোর) দত্তক নেন, তখনই ঠিক হয়েছিল তাঁর সম্পত্তির ভবিষ্যৎ অধিকারী হবেন তাঁর দত্তক পুত্রই। এই দত্তক নেওয়ার দুবছরবাদে হরিকিশোরের আপন ঔরস পুত্র নরেন্দ্রকিশোর ও দুই কন্যা মনোরমা ও সুরবালার জন্ম হয়।

কলকাতায় পড়তে এসে উপেন্দ্রকিশোর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মেলামেশা করছেন এটা পছন্দ করেন নি হরিকিশোর। তিনি ছেলেকে এ ব্যাপারে সতর্কও করে দিয়েছিলেন। পরে যখন তাঁর কানে এল উপেন্দ্রকিশোর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি তাঁর উইলে উপেন্দ্রকিশোরকে তাঁর সম্পত্তির মাত্র এক-চতুর্থাংশ দিয়ে যান।

কিন্তু হরিকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী রাজলক্ষ্মী ওই উইল নষ্ট করে উপেন্দ্রকিশোরকে সম্পত্তির অর্ধাংশের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। রাজ-লক্ষ্মীর এই মহানুভবতার ফলে উপেন্দ্রকিশোর তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হননি।

উপেন্দ্রকিশোর ও নরেন্দ্রকিশোর সম্পত্তির সমান অংশের অধিকারী হলেও তাঁদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পত্তির ভাগ হয় অনেক পরে। এই সম্পত্তি ভাগ নিয়ে একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী শোনা যায়ঃ 'উপেন্দ্রকিশোর তখন তাঁর ছাপাখানা নিয়ে খুবই ব্যস্ত। একসময়ে তিনি ভাবলেন, ছোটো ভাই নরেন্দ্রকিশোরকে আর এ সবের মধ্যে জড়াবেন না। তখনও দেশের বিষয় সম্পত্তি এক সঙ্গেই ছিল। উপেন্দ্রকিশোর তখন থাকতেন কলকাতায়, আর নরেন্দ্রকিশোর মসুয়ায় থেকে জমিদারী দেখতেন—পরামর্শ নিতেন মা রাজলক্ষ্মীর কাছে।

উপেন্দ্রকিশোর একদিন ছোটো ভাইকে বললেন, 'দেখ, আমি কলকাতায় ব্যবসা করি, তাতে ক্ষতিও হতে পারে। তুমি যাতে ভবিষ্যতে এ ব্যবসায় জড়িয়ে না পড়, তার জন্য জমিদারী ভাগ করে নেওয়াই সমীচীন হবে'।

১৯০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। উপেন্দ্রকিশোর কলকাতা থেকে মসুয়ায় গেলেন বিষয়সম্পত্তি সব ভাগ করতে। এতো বড় বিষয় ভাগ হবে কাজেই

আত্মীয়স্বজনরা মসূয়ায় এসে জুটলেন মধ্যস্থতা করার জন্য। তাঁরা উপযাচক হয়ে দুই ভাইকে নানা রকম বুদ্ধি-পরামর্শ দিতে লাগলেন।

উপেন্দ্রকিশোর তাদের স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'না, এর মধ্যে কেউ নাক গলাতে আসবে না। আমরা দু'ভাই আমাদের বিষয় ভাগ করে নেবো—তোমরা যে যার বাড়ি সরে পড়।'

তারপর ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, 'লাহিড়ী মশাই, সমস্ত বিষয়সম্পত্তির একটা লিস্ট করুন এবং ভালো একটা ম্যাপ এঁকে আমার কাছে নিয়ে আসুন।

যখন কাগজপত্র সব প্রস্তুত হলো, উপেন্দ্রকিশোর ছোটো ভাইকে ডেকে বললেন, 'চলো, এবার আমরা বসি।' একদিন দু'ভাই কাগজপত্র নিয়ে ঘর বন্ধ করে বসলেন, অন্য কাউকে থাকতে দিলেন না।

নরেন্দ্রকিশোরকে উপেন্দ্রকিশোর বললেন, "নরু···আমি বিদেশে থাকবো, কোনোদিনই দেশে ফিরবো না কিন্তু তুমি দেশে থেকে জমিদারী করবে, তাই মসূয়ার ও মৈমনসিংহের বাড়ি ও মসূয়ার কাছের সম্পত্তি তুমি নিজে রাখো, আর দূরের সম্পত্তিগুলি আমি নেই।'···

দুই ভাইয়ের মধ্যে এত বড় বিষয় সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেল, তৃতীয় ব্যক্তি এ সম্বন্ধে বিন্দু-বিসর্গও জানলো না। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

এ বিষয়ে বাবাকে বলতে শুনেছি, 'সত্যি, দাদা ছিলেন দেবতা। মসূয়ার ও মৈমনসিংহের বাড়িঘর সমস্ত আমার ভাগে দিয়ে দিলেন, এমনকি মসূয়া মৌজায় তিনি একবিঘা জমিও নিজের জন্য রাখলেন না।'[১]

এ ঘটনা ১৯১০ বা তার কাছাকাছি সময়ে হওয়া সম্ভব। কন্যা পুণ্যলতাকে সম্ভবত এই সময়ে লেখা একটি চিঠিতে উপেন্দ্রকিশোর জানিয়েছেন: 'দেশে গিয়ে আমাতে আর তোমার কাকাতে সব বিষয় ভাগ করে নিয়েছি। আমার যা ঋণ ছিল তার অধিকাংশই শোধ হয়ে গেছে, বাকি যা তাও আর ৪/৬ মাসের মধ্যেই শোধ হবে আশা করি। তারপর যা থাকবে, তাতে বোধ হয় এতদিনে আমাদের যেমনভাবে চলছে, তেমনি করেই চলে যাবে। তার উপর কলকাতায় একখানা বাড়ীও হতে পারবে। ব্যবসাটার অবস্থা একটু একটু করে ভালর দিকে চলেছে। এর আরো উন্নতি হলে এতেই আমাদের চলিত খরচ নির্বাহ হওয়ার আশা করা যায়! তখন দেশের ঐ অবশিষ্ট সম্পত্তির আয় থেকে তাতন [সুকুমার], মণি [সুবিনয়] আর বাদনের [সুবিমল] বিলাত যাওয়ার খরচও চলে যাবে।'[২]

১: হিতেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, 'উপেন্দ্রকিশোর ও মসূয়া রায় পরিবারের গল্পসল্প', ১৩৯০, পৃ. ২৫, ২৬। ২: সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'উপেন্দ্রকিশোর: শিল্পী ও কারিগর', "এক্ষণ", শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯১, পৃ. ৭৮।

সুকুমারের ছাত্রদশায় ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠে। যে বছর তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করেন (১৯০২) সেই বছর আনুষ্ঠানিক-ভাবে 'অনুশীলন সমিতি'র ও 'ডনসোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ব্রহ্মবান্ধবের আগ্নেয় পত্রিকা 'সন্ধ্যা' বেরিয়েছে ১৯০৪ সালে, 'যুগান্তর' মার্চ ১৯০৬-এ। বঙ্গভঙ্গের আয়োজন তীব্রভাবে সমালোচিত হচ্ছে সর্বত্র। এই সময় ব্রিটিশ সরকারের একের পর এক দমনমূলক সার্কুলারের প্রতিকার করতে অ্যাণ্টি-সার্কুলার সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯০৫ খ্রি.-এর ৪ঠা নভেম্বর।

উপেন্দ্রকিশোর বা সুকমার প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেন নি। কিন্তু আর দশটা মানুষের মতই রাজনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া তাঁদের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। ১৩১০ সালের কার্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে উপেন্দ্রকিশোরের একটি সচিত্র 'পলিটিক্যাল স্যাটায়ার' ছাপা হয়েছিল। এর প্রায় পাঁচবছর বাদে 'Modern Review' পত্রিকায় [আগস্ট সংখ্যা, ১৯০৮] উপেন্দ্রকিশোর অঙ্কিত ছবিসহ লেখাটি ইংরেজিতে পুনঃ প্রকাশিত হয়েছিল। এর বেশ কিছুকাল আগে শ্রীহট্টে জনৈক চা-কর সাহেবের সবুট লাথিতে ১৪/১৫ বছরের উমেশ নামে এক কুলীর প্লীহা ফেটে মৃত্যুর ঘটনা[১] ও তৎকালের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিক্রিয়া তীব্র শ্লেষ মণ্ডিত হয়েছে উপেন্দ্রকিশোরের 'প্লীহা রক্ষক' নামক ওই রচনাটিতে। লেখাটি ছদ্মনামে ও বিজ্ঞাপনের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিক্রিয়া কত তীব্র এবং তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কত লক্ষ্যভেদী ও তীক্ষ্ণাগ্র হতে পারে লেখাটি তারই উদাহরণ। একই সময়ে 'ভারতী' পত্রিকার ১৩১০ আষাঢ় ('বিলাতী ঘুষি বনাম দেশীকিল') ও কার্তিক সংখ্যায় ('কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম') একই ধরনের লেখায় ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তাকে ব্যঙ্গ-কৌতুকের ছলে তিরস্কার করা হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় জাতীয় নেতাদের ছবির ব্লক তৈরি হত ইউ. রায়ের কারখানায়।[২] আলিপুর বোমার মামলায় সদ্যমুক্ত অরবিন্দের ছবি তুলেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। 'প্রবাসী' ১৩১৬, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়, ছবিটি ছাপা হয়েছিল উপেন্দ্রকিশোরের তৈরি ব্লকে। স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে উপেন্দ্রকিশোরের মনোভাব এ থেকে অনেকটা আন্দাজ করা যায়।

১৯০৫-এর ৩০ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর মানুষ এর বিরোধিতা করেছিলেন—বাঙালী জীবনে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছেল সুষুপ্তি থেকে নির্মম কশাঘাতে অকস্মাৎ জেগে ওঠার মতো। জাতীয়তাবাদী সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রের একাংশ যেন এই সময়ে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। এই সময়ে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার 'কর্তব্য নির্ধারণ' নামে এক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়ঃ

'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙ্গালীর চিরাশৌচ হইবে। যতদিন বঙ্গদেশের ছিন্নঅঙ্গ পুনরায় একত্র না হয় ততদিন বাঙ্গালীর চিরাশৌচ হইবে।'…'জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙ্গালী বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করিবে।'[৩]

পুণ্যলতা চক্রবর্তী এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেনঃ 'আমরাও সমস্ত সৌখিন বিদেশী জিনিস ছেড়ে দিয়ে মোটা দেশী জিনিস ব্যবহার করতে আরম্ভ করলাম।'…'মণি [সুবিনয় রায়]…দেশী সুতোর মোটা কাপড়, হাতে তৈরী তুলোট কাগজ, ট্যারা-ব্যাঁকা পেয়ালা-পিরিচ খুঁজে পেতে নিয়ে আসত। দেশী জিনিস প্রথমে পাওয়াই মুশকিল হত, যা-ও বা পাওয়া যেত, তাও অত্যন্ত মোটা অসুন্দর। দাদা [সুকুমার] তাই ঠাট্টা করে গান লিখেছিলঃ 'দেশী পাগলার দল'।…'ঠাট্টা করলেও দাদা হাসিমুখে ঐ সব মোটা জিনিস ব্যবহার করত। একদিকে যেমন হাসির গান লিখেছিল, তেমনি আবার সুন্দর গম্ভীর স্বদেশী গানও লিখেছিলঃ 'টুটিল কি আজি ঘুমের ঘোর'।[৪]

১৯০৫-এর ৫ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিন ২৯৪নং আপার সার্কুলার রোডে যে বিরাট জনসভা হয়েছিল ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের নতুন বাড়ির ছাদ থেকে সে সভা প্রত্যক্ষ করেছিলেন পুণ্যলতারা। বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ, অখণ্ড বঙ্গ ভবনের (মিলন মন্দির ঃ Federation Hall) ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, রাখীবন্ধন —অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। সভাপতি আনন্দমোহন বসু প্রবল অসুস্থতা সত্ত্বেও ইজিচেয়ার বাহিত হয়ে এসেছিলেন সভায়। উপস্থিত ছিলেন সুরেন ব্যানার্জী রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে সেকালের বহু বিখ্যাত পুরুষ। প্রায় ৫০ হাজার লোক হয়েছিল সেই সভায়।[৫] পুণ্যলতা ও রায়-পরিবারের অন্যান্যদের মতোই সুকুমার সুনিশ্চিতভাবে সেই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পুণ্যলতা লিখছেনঃ 'বিকেলে চারিদিক থেকে দলে দলে গান করতে করতে সকলে সার্কুলার রোডে বিরাট এক জনসভায় এসে মিলল। দেশটাকে দুইখণ্ড করলেও বাঙ্গালী জাতিটা কিছুতেই দুইভাগ হবে না, তার চিহ্ন স্বরূপ 'অখণ্ড-বঙ্গ-ভবন' [Federation Hall] তৈরী করা হবে, সেই সভায় তার 'ভিত্তিস্থাপন' হল। ঠিক তারপাশেই আমাদের সেই পুরানোস্কুলের নতুন বাড়ি হয়েছে, আমরা এবং আরো অনেক মেয়েরা স্কুলবাড়ির বারান্দা ও ছাতে বসে সভা দেখলাম।[৬] এত অসংখ্য লোক, এমন বিরাট গম্ভীর সভা আমরা আগে দেখিনি।'

এর কয়েকবছর আগে একটি ঘটনা থেকে সুকুমারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কোন বিশেষ ধারাকে বেছে নিচ্ছে তা খানিকটা আন্দাজ করা যায়। পুণ্যলতা লিখছেনঃ 'মনে পড়ে বছর চার পাঁচ আগে [বঙ্গভঙ্গের] দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ার যুদ্ধ হয়েছিল। আমরা তখন মনে-প্রাণে ইংরেজ ভক্ত, ইংরেজের জয় শুনলেই খুশী হই। একদিন কাগজে একটা যুদ্ধে ইংরেজরা খুব জিতছে

দেখে আমি উৎসাহের সঙ্গে খবরটা সবাইকে শোনাচ্ছি, দাদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, "নিজেরা মার খেয়ে মাটিতে পড়ে আছিস্, আবার অন্যের মার খাওয়া দেখে হাসছিস।" ভারী অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম।'[৭]

বুয়র যুদ্ধ হয়েছিল ১৮৯৯-১৯০২ খ্রি. পর্যন্ত। সুতরাং এ ঘটনা বঙ্গ-ভঙ্গের আগে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বুয়র যুদ্ধ নিয়ে সে সময়ে পত্র-পত্রিকায় খুব আলোচনা হয়েছিল। সেকালে 'সঞ্জীবনী', 'সমীরণ', 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী' ইত্যাদি পত্রিকায় যা লেখা হয়েছিল, তার সার কথা হল যে ইংরেজ উচিত শিক্ষালাভ করেছে একটি ক্ষুদ্র শক্তির কাছে।

উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদিত 'সন্দেশ'-এ একসময়ে পঞ্চম জর্জের ৪৮ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত জীবন কথা, ছবি ইত্যাদি ছাপা হয়েছে।[৮] কিন্তু এ থেকে 'সন্দেশ' রাজভক্ত একথা অনুমান করা অন্যায় হবে। তাঁদের সাধনা ও সংগ্রামের ক্ষেত্র ছিল ভিন্ন এবং প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় আত্মক্ষয় একথা হয়ত তাঁরা মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে কবিগাথা'র (১৮৭৭) ভূমিকায় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উক্তি উপেন্দ্রকিশোরের ওপর আরোপ করে বলা চলে: 'অনেকে আমাদিগের রাজভক্তি দেখিয়া মনে করিতে পারেন, পরাধীনতাই আমাদিগের পূজ্য, বস্তুত তাহা নহে। জাতীয় স্বার্থ আমাদের রাজভক্তির মূল—বর্তমান সময়ে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শাসনতন্ত্র আমরা আশা করিতে পারি না বলিয়া আমরা প্রচলিত শাসনতন্ত্রে বিশ্বাসী।'

সুকুমার রাজনীতি সম্বন্ধে নীরব থাকলেও তাঁর মনোভাব কিসের অনুবর্তী ছিল তা অনুমান করা যায়—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রচিত এই গানটি থেকে:

'টুটিল কি আজি ঘুমের ঘোর?
কত আর বল রবে বিভোর?
পরদ্বারে গিয়ে ভিখারীর সাজে
ফিরে এলি ঘৃণা অপমান লাজে,
পরের প্রত্যাশা অনুগ্রহ আশা
আর সে ভরসা কোথা রে তোর?
ঘরের সন্তান ফিরে আয় ঘরে
আয় ফিরে আয় মায়ের আদরে।
শোন্ রে শোন্ রে ডাকেন জননী
জন্মদুখিনী জননী তোর।'[৯]

১: কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পা. ও সংকলিত, 'সঞ্জীবনী', ১৯৮৯, পৃ. ১৬৬। ২: উপেন্দ্র-চন্দ্র ভট্টাচার্য: 'আমার এলোমেলো জীবনের কয়েকটি অধ্যায়', পৃ. ১০৩। ৩: 'সঞ্জীবনী'...,

পৃ. ১২। ৪ঃ পুণ্যলতা…, পৃ. ১৪০-১৪১। ৫ঃ 'প্রসঙ্গ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও মিলন মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা', "প্রদীপ", কার্তিক ১৩১২। ৬ঃ পুণ্যলতা…. পৃ. ১৩৯। ৭ঃ তদেব, পৃ. ১৩৮। ৮ঃ দ্র. "সন্দেশ", জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ সংখ্যা, পৃ. ৩৩, ৩৪-৩৮। ৯ঃ 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র' ৩য় খণ্ড. সম্পা. সত্যজিৎ রায়, ১৯৮৯, পৃ. ১৫৩।

৫

তর্কযুদ্ধে সুকুমার যে নিতান্ত অপটু ছিলেন না, তার প্রমাণ, 'ভারতীয় চিত্রশিল্প' বিতর্ক। এটি বিলেত যাবার বছর খানেক আগের ঘটনা। এই তর্কযুদ্ধের জন্ম-ইতিহাস বেশ কৌতূহলের। সুকুমারের বাল্যবন্ধু বিমলাংশু-প্রকাশ রায় লিখছেনঃ 'ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রকলার প্রস্তুতির দিন ছিল তখন। ভারতীয় চিত্রকলা তখনো দেশে ঠিক সমাদর পাচ্ছিল না। সমাদর যাতে হয় তার জন্য প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন রামানন্দবাবু তাঁর 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ-রিভিউ' মারফৎ। প্রতি সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের, নন্দলালের বা তাঁদের শিষ্যদের ছবি ছাপা হত এবং সম্পাদকীয় ব্যাখ্যা ও প্রশস্তি থাকত বিধিমত। তার ফলে ভারতীয় পদ্ধতিতে ছবি দেখবার মতো দৃষ্টি দেশের লোকের ধীরে ধীরে ফুটতে লাগল। এমনি সময় একদিন আমার কি একটা খেয়াল হল—ভারতীয় চিত্র-কলার কয়েকটি ত্রুটী প্রদর্শন করে একটা ছোট নিবন্ধ লিখে 'প্রবাসী'র ডাক্-বাক্সটিতে ফেলে দিলাম। রামানন্দবাবু সেটাকে অবিলম্বে 'প্রবাসী'তে ছেপে দিলেন এবং তারই সঙ্গে নিজের মন্তব্য জুড়ে দিলেন। সেটা ছিল ১৩১৭ সালের ভাদ্র সংখ্যা। ২রা ভাদ্র তারিখে অর্থাৎ 'প্রবাসী' প্রকাশিত হবার পরদিন সুকুমারের সঙ্গে আমার যেই দেখা হয়েছে তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'অ্যাঁ! বিমলাংশু করেছ কি! রামানন্দবাবুর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নেমেছ!' যাই হোক পরের সংখ্যা 'প্রবাসী'তে দেখি শিল্পী অর্দ্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের [অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়] তীব্র সমালোচনা বেরিয়েছে আমার লেখাটার উপর। আবার তার পরের সংখ্যায় প্রবাসীতে দেখি সুকুমার রায়ের পাল্টা দীর্ঘ সমালোচনা অর্দ্ধেন্দ্র কুমারের লেখার বিরুদ্ধে। তার পরের সংখ্যায় আবার অর্দ্ধেন্দ্রর এবং তার পরের সংখ্যায় আবার সুকুমারের লেখার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকীয় নির্দেশে রয়েছে এ বিষয়ে আর আলোচনা চলবে না।'[১]

সুকুমার এই সমালোচনার সমালোচনা যে সময়ের, তার কিছুকাল আগে ভারতীয় শিল্পকলা আবিষ্কার ও পুনর্নির্মাণের যুগ চলেছে। সেকালের অনেক মনীষীই যেমন অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ কেণ্টিশ কুমার স্বামী, ই. বি. হ্যাভেল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এর সমর্থক ও প্রবক্তা। কিন্তু এর ফলে অন্য ধারার অনেক শিল্পী তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা পান নি, যেমন।

পান নি উপেন্দ্রকিশোর, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শশী হেস, রোহিনীকান্ত নাগ—এঁরা। এই নব্য শিল্প আন্দোলনে ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া ও শিল্পের বাস্তব-জ্ঞানকে অস্বীকার করা সুকুমারের কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় 'Modern Review' জুন ১৯০৭ সংখ্যায় 'The Study of Pictorial Art in India' বলে উপেন্দ্রকিশোর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে উপেন্দ্রকিশোরের বক্তব্য ছিল অনেকটা সুকুমারেরই অনুরূপ। এই প্রবন্ধটিকে তীব্র এবং বেশ কিছুটা অন্যায় আক্রমণ করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন অর্দ্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সংখ্যা)। উপেন্দ্রকিশোর মডার্ন রিভিউ-এর নভেম্বর সংখ্যায় (১৯০৭) অর্দ্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের যুক্তিগুলি খণ্ডন করেছিলেন।

এর তিন বছর বাদে একই বিতর্কের পুনরুত্থানে অর্দ্ধেন্দ্র গাঙ্গুলী তথা নব্য ভারতীয় চিত্রশিল্প আন্দোলনের তৎকালীন প্রবক্তাদের বিরোধিতা করলেন উপেন্দ্রকিশোর-পুত্র শাণিত যুক্তি ও তীব্র শ্লেষ মিশিয়ে। এই বিতর্ক এমন আকার নিয়েছিল যে 'শেষ পর্যন্ত প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় ধৈর্য হারিয়ে জোর করে আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।'[২]

১ঃ বিমলাংশুপ্রকাশ রায়, 'সুকুমার রায়ের স্মৃতি', "তত্ত্বকৌমুদী", ১ ও ১৬ কার্তিক, ১৩৭৩, পৃ. ১০৮-১১১। ২ঃ লীলা মজুমদার, 'সুকুমার রায়', ১৩৭৬, পৃ. ৩৩।

৬

উপেন্দ্রকিশোর ময়মনসিংহে ছাত্রাবস্থায় বন্ধু গগনচন্দ্র হোম ও ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের শিক্ষক আদর্শব্রতী ব্রাহ্ম শরৎচন্দ্র রায়ের প্রেরণায় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।[১] কলকাতায় এফ. এ. ও বি. এ. পড়তে এসে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন এবং ১৮৮৪ বি. এ. পাশ করার পর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষা নেন। ১৮৮৫ খ্রি.-এ দ্বারকানাথ কন্যা বিধুমুখীকে বিবাহ করার পর সংশ্লিষ্ট সমাজের সঙ্গে তাঁর যোগ আরো দৃঢ় হয়।

তাই 'সুকুমারের শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবন অতিবাহিত হয়েছে একটি নিটোল সুন্দর উষ্ণ পরিবেশে। গুরুজনেরা সকলেই গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসী, ব্রাহ্ম সমাজের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানব সেবার আদর্শে দৃঢ় আস্থাশীল। ব্যক্তিত্বের অবাধস্ফূর্তির উপর পড়ত ঘনসন্নিবিষ্ট মণ্ডলীগত চেতনার তৃপ্তিকর প্রলেপ, কিন্তু কোথাও তা ব্যক্তি-স্বরূপের বিকাশে বাধা জন্মাত না।'[২]

স্বাভাবিকভাবে ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান হওয়ায় তিনি আশৈশব সমাজের

নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যপদ নেন ১৯০৭ সালে বি. এস-সি. পাশ করার পর।[৩] এর আগে অবশ্য অন্যান্য অনেক ব্রাহ্ম-পরিবারের সন্তানের মতো তিনি নিজেকে যুক্ত করেছেন ছাত্র-সমাজ বা Students Weekly Service-এর সঙ্গে। [পরবর্তীকালে এর কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য, ক্রমে সেক্রেটারি, ১৯১৯-এ ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ও ১৯২০-তে সুকুমার প্রেসিডেণ্টও হয়েছেন।] ১৯১০-এ তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'যুবকদের প্রার্থনা সভা'। সেই সময় থেকে উপাসক-মণ্ডলীর 'সহকারী সম্পাদক'ও হয়েছেন। ১৯১১ খ্রি.-এর জুলাই মাসে বিদেশ যাবার আগে উপাসক-মণ্ডলীর একটি বিশেষ অধিবেশনে তাঁর বদলে সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব ভার নেন গগনচন্দ্র হোম।[৪]

ব্রাহ্ম কর্মী ও নেতা সুকুমারের পরিচয়ের একটি দিক এখানে আলোচনা করা যায়।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে ২৭ এপ্রিল শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় 'ছাত্র সমাজ'। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্রাহ্ম-পরিমণ্ডলে টেনে আনা ও আদর্শবাদে দীক্ষিত করা। প্রথম দিকে প্রত্যেক রবিবার সিটি স্কুলে 'ছাত্র-সমাজ'-এর কাজকর্ম চলত। এর প্রায় দু' বছর পর সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হলে (২২. ১. ১৮৮১) 'ছাত্র-সমাজ'-এর দপ্তর সেখানে উঠে গেল।

সুকুমার যখন ব্রাহ্ম-সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করেন, তখন 'ছাত্র সমাজ' ছিল কিছুটা অসংগঠিত অস্তিত্ব হয়ে। সুকুমার এই 'ছাত্র-সমাজ'কে কেন্দ্র করে গড়ে তুললেন 'ব্রাহ্ম যুব সমিতি'। তিনিই ছিলেন এর নেতা এবং পরিচালক। 'ব্রাহ্ম যুব সমিতি'র একজন সদস্য পরবর্তীকালে এ সম্পর্কে লিখছেন: ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্গত যুবকের জন্য তখন ছাত্র সমাজ ছিল বটে, কিন্তু তা তখন ছত্রাকারে। জমাট একটি ব্রাহ্ম যুব গোষ্ঠীর অভাব বোধ করছিলেন সুকুমার। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সকলেই মহা উল্লাসে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। আর অবিলম্বে তিনি গড়লেন ব্রাহ্ম যুব সমিতি। এইভাবে ব্রাহ্ম যুব সমিতির পত্তন। ···অনেক ব্রাহ্ম যুবক এসে যোগ দিলেন। সমাজে একটা নতুন সাড়া পড়ে গেল। মরা গাঙে বান ডাকল। সপ্তাহে একদিন—বুধবার সমাজ-মন্দিরেই উপাসনা ও আলোচনাদি চলতে লাগল। আশাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেই যৌবনকালেই প্রাণস্পর্শী উপাসনা করতেন। তাই সুকুমার তাঁকে দিয়েই অধিকাংশ দিন উপাসনা করিয়ে নিতেন, তারপর চলত সকলের আলোচনা।'[৫]

শুধু উপাসনা আলোচনা নয় সমিতির সভ্যরা মাসে একবার করে কলকাতার নানা জায়গায় বা কলকাতার বাইরে সুকুমারের নেতৃত্বে বেড়াতে যেত। এইভাবে

তাঁরা একবার গিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বালিগঞ্জের বাগান বাড়িতে। সেখানে তাঁদের আপ্যায়ন করেছিলেন স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ। এইভাবে কখন তাঁরা নৌকা করে গিয়েছেন বালি অথবা বরাহনগরে কোনো ব্রাহ্ম-গৃহস্থের বাড়ি।[৬]

এইরকম একটি ছুটির দিনের বর্ণনা সুকুমার দিয়েছেন এইভাবে:

মাঘোৎসবের স্টিমার পার্টি মস্ত মজার ব্যাপার
জ্বরো রোগী চলল ক্ষেপে মাথায় বেঁধে র‍্যাপার।
খাবার দাবার নিয়ে সবাই উঠল নায়ে চেপে
মংলু এল শিং বাগিয়ে জংলু গেল ক্ষেপে।[৭]

ব্রাহ্ম যুব সমিতির অধিকাংশ তথ্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলেও যে আরো দু' একটি সংবাদ জানা যায় তা হল: এই সমিতির একটি অনুষ্ঠানে ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য 'স্বরাজ্য' নামে একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেন ১৩১৬ সালে।[৮] এ ছাড়া এই সমিতি আচার্য নবদ্বীপচন্দ্র দাসকেও সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে সুকুমার ভাষণও দিয়েছিলেন।[৯]

ব্রাহ্ম যুব সমিতিকে কেন্দ্র করে ১৯১০-এ এই সমিতির মুখপত্র 'আলোক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর জন্ম-ইতিহাস এরকম: '[সুকুমার] একদিন বললেন—আমরা যা কথোপকথন করি তা সবই উড়ে যায়; স্থায়ীভাবে সে সব সম্পদকে ধরে রাখতে চাই আমাদের নিজস্ব পত্রিকা। বন্ধুদের মধ্যে আবার উৎসাহের ঘটা পড়ে গেল। বেরুল 'আলোক' নামে মাসিক পত্রিকা।'

'আলোকের মূল্য ধার্য হল প্রতি সংখ্যা চার আনা। কিন্তু প্রথম সংখ্যা আলোকের প্রকাশনখানি ব্রাহ্ম মিশনের প্রেসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিলামে চড়ালেন সুকুমার নিজে। যার ডাক সর্বাপেক্ষা উপরে যাবে সেই পাবে। বলতে লাগলেন তার গৌরব কত। প্রথম আলোকপ্রাপ্ত ভাগ্যবান হবে সে। ডাক চড়তে লাগল। একটাকা, দু'টাকা, তিনটাকা। এমনি করে শেষটায় সর্ব্বোচ্চ ডাক উঠল মঙ্গলুর দশটাকা। আমরা সবাই মিলে তৎক্ষণাৎ মঙ্গলুকে [দ্বারকা-নাথ পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়] কাঁধে করে খানিকক্ষণ সমাজের মাঠটাতে ঘুরে ঘুরে সম্বর্ধনা করলাম। সারা পাড়াময় সেদিন কী উদ্দীপনা। সে এক যুগ গেছে।'[১০]

আলোকের প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল 'আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো'—রবীন্দ্রনাথের এই গানটি। পূর্ব প্রকাশিত এই গানটিকে সুকুমার নামকরণের তাৎপর্যের সঙ্গে মিলিয়ে পত্রিকার জন্য নির্বাচন করেছিলেন।

'আলোকে সুকুমারের ও বন্ধুদের লেখা বিস্তর ছাপা হতে লাগল।'[১১]

কিন্তু 'আলোক'-এর কোন ফাইল আজ পর্যন্ত না পাওয়া যাওয়ায়—বিমলাংশু-প্রকাশের সাক্ষ্যের বাইরে আর কিছুই জানা যায় না।

সুকুমারের বিলেত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত 'আলোক'-এর সমাপ্তি। ব্রাহ্ম যুব সমিতির একটি পর্বও শেষ হয় সেই সঙ্গে।

১ঃ সুকুমার রায়, 'উপেন্দ্রকিশোর রায়', "সুকুমার সাহিত্য সমগ্র" ৩য় খণ্ড, পৃ ৭৭-৭৯, [উৎস ঃ মাঘ, ১৩২২ সংখ্যা "প্রবাসী" ঃ ব্রাহ্ম-সমাজে উপেন্দ্রকিশোরের শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত শ্রদ্ধার্ঘের পুনর্মুদ্রণ]। ২ঃ দিলীপ কুমার বিশ্বাস, 'সুকুমার রায় ও ব্রাহ্মসমাজ', "দেশ", ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬। ৩ঃ দ্র, স্বপন মজুমদার, 'সুকুমার রায় ও তরুণ ব্রাহ্ম সমাজ', "শতায়ু সুকুমার", ১৯৮৮, পৃ. ৬৪। ৪ঃ 'ছবিতে সুকুমার', গ্রন্থনা ঃ সন্দীপ রায় ও সিদ্ধার্থ ঘোষ, ১৯৯০, দ্র. ঃ পৃ. ৫৪-৫৮। ৫ঃ বিমলাংশুপ্রকাশ রায়, 'সুকুমার রায়ের স্মৃতি'… । ৬ঃ তদেব। ৭ঃ কল্যাণী কার্লেকার "ভূমিকা", সুকুমার সমগ্র রচনাবলী', ১ম খণ্ড, ১৯৭৪, পৃ. ১৩। ৮ঃ 'ডক্টার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য / জীবন প্রসঙ্গ ও উপদেশাবলী', ১৯৭৩, পৃ. ৬৮-৭৭। ৯ঃ দিলীপকুমার বিশ্বাস… , পৃ ৯৫। ১০ঃ বিমলাংশুপ্রকাশ রায়…। ১১ঃ তদেব।

তৃতীয় অধ্যায়

১৯১১-১৯১৪

প্রসঙ্গ ঃ

১ ঃ বিলেত পাড়ি ঃ প্রসেস-বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা ঃ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ঃ রবীন্দ্র-সান্নিধ্য ঃ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

২ ঃ বিবাহ

৩ ঃ সাহিত্যচর্চা ঃ 'চিরন্তন প্রশ্ন', 'ভাবুক সভা', 'শিল্পে অত্যুক্তি', অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের অনুবাদ 'হিন্দুরা ব্রাহ্ম কিনা' বিতর্কে অংশগ্রহণ

১

বি. এস-সি. পাশ করার চারবছর পর ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সুকুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপ্রসন্ন ঘোষ মেধাবৃত্তি নিয়ে মুদ্রণ ও প্রসেস-শিল্পে উচ্চ-শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে যান।

এই গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি চালু হয় ১৯০৭ খ্রি.-এ। এই বৃত্তি অর্জনের যোগ্যতা সম্বন্ধে গুরুপ্রসন্ন ঘোষের উইলে বলা হয়েছে: আবেদনকারীকে হিন্দু হতে হবে এবং 'a real native of Bengal.' গ্রাজুয়েট হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু যে বিষয় শিখতে যাওয়া হচ্ছে সে ব্যাপারে প্রাথমিক জ্ঞান প্রয়োজন। উইলে বলা হয়েছে, উৎসাহী পূর্বজ্ঞান সম্পন্ন তরুণরা এবং 'The sons of artisans and mechanics···' এই বৃত্তি পাওয়ার অধিকারী। এই বৃত্তির একসময়ে বাৎসরিক পরিমাণ ছিল ২000 টাকা। বিভিন্ন দেশের হাইকমিশনের সাহায্যে যোগাযোগ করে শিক্ষার্নবিশির স্থান ঠিক করা হত এবং সেই অনুসারে প্রাপক নির্বাচন করা হত। ১৯১৯-এ মেঘনাদ সাহাও এই বৃত্তি পেয়েছিলেন।

১৯১১ খ্রি.-এ সুকুমার ছাড়াও জনৈক সমরেন্দ্র মল্লিক এই মেধাবৃত্তি অর্জন করেন।[১]

১৯১১ খ্রি.-এর ৭ই অক্টোবর বোম্বাই থেকে Peninsular and Oriental Company[২]-র S. S. Arabia জাহাজে সুকুমার ইংলণ্ডে পাড়ি দেন। হাওড়া থেকে রেলে বোম্বাই যাবার প্রাক্কালে বন্ধুকে অন্যান্যদের সঙ্গে বিদায় জানাতে এসে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মবিশ্বাসী উদ্দীপ্ত মুখচ্ছবি দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন।[৩] সম্ভবত এর কয়েকদিন আগে সুকুমার বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনদের নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন। অনুষ্ঠানটির ছাপান নিমন্ত্রণ-পত্রে বিলেত যাবার আয়োজনের সরস বর্ণনা আছে এবং তা স্বয়ং সুকুমারেরই লেখা:

> করে তাড়াহুড়ো বিষম ছোট
> কিনেছি হ্যাট কিনেছি কোট্
> পেয়েছি passage এসেছে Boat
> বেঁধেছি তল্পি তুলেছি মোট্
> বলেছে সবাই, তা হলে ওঠ্
> আসান এবার বিলেতে ছোট্।"

তাই সভা হবে বিদায় ভোট
কাঁদ কাঁদ ভাব ফুলিয়ে ঠোঁট্
হেথায় সকলে করিবে জোট্
(প্রোগামটুকু করিও Note)।

প্রোগ্রাম—
শুক্র সন্ধ্যা সঠিক সাত
আহার আমোদ উল্কাপাত।[৪]

S, S. Arabia জাহাজ থেকে বাবা-মাকে যাত্রাপথে তিনি চিঠি লিখে জানিয়েছেন ইউরোপীয় পোশাকে, খাদ্যে তিনি কিছুটা অভ্যস্ত হচ্ছেন। যাত্রা-পথের ছোটখাট মজার ঘটনা অল্পকথায় তুলে ধরেছেন বোনকে লেখা চিঠিতে। মাকেও চিঠিতে কৌতুক করে জানিয়েছেন ঃ

> 'এখন tie বাঁধা, কলার পরা অনেকটা অভ্যাস হ'য়ে এসেছে। এখন আর আধঘণ্টা লাগে না। ২/৪ মিনিটেই সব সেরে নি।'

বোম্বাই থেকে ৭ অক্টোবর যাত্রা করে এডেনে পৌঁছন ১২ অক্টোবর। এরপর পোর্ট সৈয়দ থেকে Lyon-এ প্রভাত চৌধুরীর [সেরিকালচারিস্ট ঃ ২৬ ডিসেম্বর, ১৯১৩ খ্রি-এ এঁর সঙ্গে সুকুমারের ছোটো বোন শান্তিলতার বিয়ে হয়।][৫] কাছে একদিন থেকে প্যারিস। প্যারিস থেকে ট্রেনে ক্যালে ; ক্যালে থেকে জাহাজে ডোভার হয়ে লণ্ডন পৌঁছন ২৩ অক্টোবর সন্ধ্যে ৫।। টায়।[৬]

সুকুমারের এই সময়ের ঠিকানা ২১ ক্রমওয়েল রোড, সাউথ কেনসিংটন, লণ্ডন। এই বাড়িতেই ছিল ডাঃ প্রসন্ন কুমার রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের চেষ্টায় স্থাপিত ভারতীয় ছাত্রদের ছাত্রাবাস। তাছাড়া National Indian Council-এর অফিস এবং North Brook Society-র অফিস ছিল এই বাড়িতেই। Crammer Bying তখন North Brook Society-র সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই বাড়িতে এসেছেন। তাছাড়া সেকালে ও পরবর্তীকালে বিখ্যাত এমন অনেক মানুষ এই বাড়িটিতে নানা-কারণে এসেছেন, থেকেছেন। সুকুমারের চিঠি থেকে জানা যায় জনৈকা Miss Beck ছিলেন এই সময় National Indian Council-এর সম্পাদিকা।

লনডনে আসার কয়েকদিনের মধ্যে সুকুমার ভর্তি হন London County Council-এর School of Photoengraving & Lithograpy-তে। ঠিকানা ঃ Bolt Court, Fleet St., E. C.। তাঁর বর্তমান ঠিকানা ২১ নম্বর ক্রমওয়েল রোড থেকে ৫/৭ মাইল দূরে প্রসেস-শিল্পের এই স্কুলটি। যেতে হয় আণ্ডার গ্রাউণ্ড ইলেকট্রিক ট্রেনে।

এই সময় এই শিক্ষায়তনে ভর্তির ব্যাপারে সুকুমারকে সাহায্য করেছিলেন William Gamble. ইনি ছিলেন প্রসেস-শিল্প ও মুদ্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি বিক্রেতা Penrose কোম্পানীর কর্ণধার। ১৮৯৫ খ্রি. থেকে এই সংস্থা প্রতি বছর Penrose's Pictorial Annual নামে মুদ্রণ-সংক্রান্ত বিখ্যাত Process Year Book ছাপা শুরু করে। W. Gamble ছিলেন তৎকালে এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

ফটোগ্রাফি ও প্রসেস-শিল্প চর্চার সূত্রেই পত্র-মারফৎ উপেন্দ্রকিশোর ও গ্যাম্বলের মধ্যে সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। উপেন্দ্রকিশোরের প্রসেস-শিল্প সংক্রান্ত ৯টি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল পেনরোজ অ্যানুয়ালে।[৭] তৎকালে ভারতীয়দের মধ্যে একক ও প্রসেস-বিদ্যায় কয়েকটি ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারের অধিকারী উপেন্দ্রকিশোরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন গ্যাম্বেল। L. C. C. স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে সুকুমারকে তিনি সাহায্য করেন ঃ

> 'কাল Penrose এর অফিসে Gamble সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম—খুব ভাল লোক। সে স্কুলে ভর্তি হতে হবে সেখানকার Principal এর কাছে চিঠি দিয়ে দিলেন—আবার পাছে রাস্তা ভুল করি সেইজন্য সব এঁকে দেখিয়ে দিলেন। চিঠি দিয়ে Principal এর সঙ্গে দেখা করে ভর্তি হয়ে পড়লাম।'

L. C. C. স্কুলে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর সুকুমার এই স্কুলের একজন শিক্ষক Mr. Grigg-এর কাছে প্রাইভেট লেশন নিতে শুরু করেন। এই শিক্ষক সম্বন্ধে সুকুমার খুব সপ্রশংস, নানাভাবে এঁর কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

> 'Mr. Grigg-এর সঙ্গে private lesson এর বন্দোবস্ত করেছি। স্কুল থেকে permission দিয়েছে। বোধহয় সপ্তাহে দু'দিনের জন্য (২ ঘণ্টা করে) ৫ শিলিং দিতে হবে।
>
> 'Mr. Griggই সবচেয়ে কাজের লোক—তাঁর নিজের করা Collotype Litho আর three colour litho অতি চমৎকার।'

এই Grigg, W. B. Havel রচিত একটি বই-এর colour litho তৈরি করেছিলেন। কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজের একসময়ের অধ্যক্ষ ও অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার চর্চার ক্ষেত্রে গুরুস্থানীয় হ্যাভেল তখন লণ্ডনে আছেন।

প্রসেস-শিল্পে উপেন্দ্রকিশোরের কাছে কাজ শেখার ফলে—এ' ব্যাপারে সুকুমারের যথেষ্ট পূর্বজ্ঞান ছিল—অন্যান্য ছাত্রদের চেয়ে তিনি অনেক এগিয়েও ছিলেন। এই সময় তিনি L. C. C.-র এই স্কুলটির কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করে উপেন্দ্রকিশোরকে লেখেন ঃ

> 'L. C. C.-এ সপ্তাহখানেক থাকলাম—Progress বেশি হচ্ছে না—

কিছু জিনিস পাওয়া যায় না—কোনরকম বন্দোবস্ত নেই।...এ রকম করে ত মিছামিছি মেলা সময় নষ্ট।'

সম্ভবত এ কারণেই পরের বছর অক্টোবর মাসে সুকুমার ম্যাঞ্চেস্টারের Municipal School of Technology-তে ক্রমোলিথোগ্রাফি ও লিথো ড্রইং শেখার জন্য ভর্তি হন। ম্যাঞ্চেস্টার রওনা হন ১২ অক্টোবর ১৯১২ তারিখে। এই মাসের ২৪ তারিখে উপেন্দ্রকিশোরকে তিনি লিখলেন ঃ

'স্কুলে প্রায় সপ্তাহখানেক কাজ করলাম—সব বিষয়েই খুব সুবিধে বোধ হচ্ছে। L. C. C.-র চেয়ে অনেক ভাল।'

এখানে তাঁর পড়াশুনোর কাজ বা উপেন্দ্রকিশোরের আবিষ্কৃত কিছু পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা ও চর্চার কাজ এগোলেও কোনো কোনো শিক্ষকের আচরণ সুকুমারকে হতাশা ও ক্ষুব্ধ করেছিল। স্পষ্টবাদী সুকুমার এ ব্যাপারে নিজের ক্ষোভ গোপন রাখেন নি। উপেন্দ্রকিশোরকে তিনি জানিয়েছেন ঃ

'ওরা এমন খারাপ রকম দোকানদারি এবং মাস্টাররা সবরকম কাজে credit নেবার জন্য এমন নিলজ্জভাবে অন্যের কাজের মধ্যে share claim করে যে আমি ঠিক করেছি যা শিখবার এখানে শিখে নি আমার কোন কাজে এদের ভাগ দিয়ে দরকার নেই। Halftone-এর gradiation সম্বন্ধে যে comparative test করব বলেছিলাম এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কাজ আমি সব করব আর R. B. Fishenden and S. Roy এই বলে paper বেরোবে।'

'Mr. Fishenden এখন অনেক বিষয়ে আমার কাজে বাধা দিতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর ইচ্ছামতো আমাকে দিয়ে যা তা বাজে কাজ করিয়ে নেন।'

L. C. C. স্কুলে থাকার সময় সুকুমার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তাঁর 'কুলি কাকা' অর্থাৎ কুলদারঞ্জনকে তিনি জানিয়েছেন ঃ

এখানে London County Council-এর নতুন Building-এর Foundation stone lay করার জন্য London County-র authority-রা King কে একটা বই present ক'রেছে—তার Coverটা আগাগোড়া হাতে লাল মরক্কোর উপর সোনার কাজ। সেই বইয়ের মলাটের একটা reproduction L. C. C.-র report-এ বেরোবে। Principal আমার উপর ভার দিয়েছেন—তা থেকে একটা facsimile reproduction করবার জন্য। Report-এ আমার নাম mention করা হবে বলেছেন।'

ম্যাঞ্চেস্টারের City & Guilds Examination-এর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন সুকুমার। উপেন্দ্রকিশোরকে তিনি লিখেছেন ঃ

'এর মধ্যে Manchester থেকে খবর পেলাম সেই যে City & Guilds Examination দিয়েছিলাম তার নাকি result বেরিয়েছে। আমায় First class, First prize, medal এই সব কি যেন দিয়েছে।'

এই পরীক্ষাটি সুকুমার নিজে অবশ্য গুরুত্ব দেন নি। পরীক্ষাটি দেবার আগে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন ঃ

'এখানে আমায় City Guilds Fxam. দেবার জন্য বিশেষ করে ধরেছেন—বিশেষতঃ Mr. Fishenden কিন্তু আমার এ Exam. দেবার একেবারেই ইচ্ছে নেই।...এ পরীক্ষাটাই নিতান্ত childish... আর তাছাড়া City & Guilds-এর Final certificateটারও বিশেষ কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না।'

প্রবাসে থাকার সময় তাঁর দুটি প্রসেস-শিল্প সংক্রান্ত প্রবন্ধ বেরিয়েছিল সুবিখ্যাত পেনরোজ অ্যানুয়ালে। তখনকার দিনে প্রসেস-শিল্প ও মুদ্রণ-সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে পেনরোজ কোম্পানির এই বার্ষিক সংকলনটি ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। [আগেই বলা হয়েছে উপেন্দ্রকিশোরের অন্ততঃ ন'টি প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।]

সুকুমারের প্রবন্ধ দুটি হল ঃ 'Halftone Facts Summerized' [Penrose's Pictorial Annual Vol. 18, 1912] এবং 'Standardizing the Original' [Vol. 19, 1913-14]।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখছেন ঃ

'Process Year Book-এর article এর জন্য খুব তাড়া দিয়েছে—এবার ওরা September মাসে publish করবে, তাই এই মাসের মাঝামাঝি সব article চায়। 'Standardising the Original' বলে একটা article লিখছি।'

এই সময় প্রসেস-সংক্রান্ত গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন প্রসেস-শিল্পের পত্রিকায় ঃ

'এবার Process Engraver's Monthly-তে Verfesser-এর বইয়ের review করেছি।'

সমালোচনাত্মক আর একটি রচনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর চিঠিতে ঃ

Brititish Journal of Photography-র Controversyটা আসছে মেইলে পাঠিয়ে দিব। মুরাওকার সঙ্গে সেদিন দেখা হলো। সে বল্লে Mr. Fishenden নাকি সেই articleটা পড়ে খুব খুশী হয়েছেন, আর ক্লাশে সেটা পড়ে শুনিয়েছেন।'

উপেন্দ্রকিশোরের ফটোগ্রাফি ও প্রসেস-সংক্রান্ত কাজ কর্মের শুরু ১৩ নং কর্নওয়ালিশে। ৩৮/১ শিবনারায়ণ দাস লেনে তিনি এ ব্যাপারে গবেষণা ও ব্যবসার জন্য আরো বেশি জায়গা পেয়ে উঠে গিয়েছিলেন। ১৯০১ খ্রি.-এ আরো ব্যবসা-সম্প্রসারণের জন্য তিনি ২২নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে চলে আসেন। ১৯১০ খ্রি.-এ তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম বদলে হল U. Ray & Sons. এর আগের নাম ছিল U. Ray-Artist.[৮] ১৯১৪-১৫ খ্রি.-এ উপেন্দ্রকিশোব নিজের প্ল্যানে তৈরি ১০০নং গড়পার রোডের বাড়িতে চলে আসেন। নিজের বাড়িতে ছাপাখানা ও প্রসেস কারখানা ও ব্যবসা বাড়ানোর পরিকল্পনা ছিল তাঁর।

বিলেত থেকে লেখা চিঠিতে দেখা যায় ভাল ছাপার মেশিন, প্রসেস সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ছবি ছাপার জন্য উৎকৃষ্ট কাগজ ইত্যাদির সন্ধান করছেন সুকুমার। অনুসন্ধান কবে বিভিন্ন ছাপার মেশিন দেখে নির্বাচনের পর কলকাতায় তা পাঠিয়েও দিয়েছেন ঃ

> 'Press সম্বন্ধে খোঁজ করে Huntersএর Brilliant-টাই আমার সব চেয়ে পছন্দ হল। পরশু দিন-এর show-room-এ গিয়ে তাদের সবচেয়ে বড় সাইজের একটা machine কি বকম দেখে আসলাম।'
>
> 'Huntersএর Brilliant No. IVটাই অর্ডাব দিলাম। প্রেসটা Fly wheel শুদ্ধ ৪৬ ইঞ্চি ওরা Fly wheel খুলে pack করবে।'
>
> 'প্রেসটা খাটান হয়েছে কি ? তাতে কেমন কাজ হচ্ছে ?'
>
> 'কাগজ বোধ হয় Grosvenor Charter & Co.-র Art Paperটা পাঠাব।'

প্রবাসে থাকার সময় বহু জায়গায় সুকুমার ছাপার কারখানা দেখতে গেছেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯১২ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে আছে তাঁর Mann & Co.-র তৈরি Flat-Bed Offset মেশিন দেখার কথা। ২৯ আগস্ট, ১৯১৩ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে পাওয়া যাচ্ছে Penrose Company-র জনৈব ব্যক্তির সঙ্গে Daily Mirror-এর এনগ্রেভিং বিভাগ ও Lascell & Co.-এর কারখানা দেখার বিবরণ। বোন টুনিকে (শান্তিলতা) লেখা একটি চিঠিতে আছে এরকমই একটি ছাপার কারখানা দেখার অভিজ্ঞতার কথা ঃ

> 'এর মধ্যে একদিন একটা প্রকাণ্ড ছাপাখানা দেখতে গিয়েছিলাম। ৭ তলা বাড়ী—Electric lift চ'ড়ে উপরে উঠলাম। এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড প্রেসে একটা magazine ("The Race Horse") ছাপা হচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড রোলারের উপর ২/৩ মাইল লম্বা কাগজের Role জড়ান রয়েছে। সেই কাগজটা একদিক থেকে ঢুক্‌ছে

আর এক দিয়ে ছাপান, ভাঁজ করা আস্ত magazine-টা ঝুর ঝুর করে পড়ছে।'

পরবর্তীকালে চোখে দেখা এই অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে ১৩২৩ বৈশাখ সংখ্যার 'সন্দেশ'-এ 'ছাপাখানার কল' রচনাটি সম্ভবতঃলেখা হয়েছে ঃ

'একটা লোহার ডাণ্ডায় প্রায় ৪/৫ হাত চওড়া কাগজের ফিতে জড়ান—ফিতেটা লম্বায় ২/৩ মাইল হবে। প্রেসের মধ্যে পর পর কতগুলো প্রকাণ্ড লোহার চোঙা ভয়ানক জোরে বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে—আর সেই সঙ্গে হুড়মুড় করে কাগজের ফিতে টেনে নিয়ে, তার ওপর ছেপে যাচ্ছে।'

দু'বছরের নিয়ত ব্যস্ততার মধ্যে বহু ধরনের কাজকর্ম, ভ্রমণ, নানা অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া, বিলেত থেকে ব্রাহ্ম যুবক সমিতির ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া, ব্রাহ্ম-ধর্ম সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া, ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া, নানা গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া—সুকুমারের চিঠি থেকে এইসব নানা ধরনের কাজকর্ম ইত্যাদির বিবরণ সংগ্রহ করা যায় ঃ

এখানে আজকাল মিসেস পি. কে. রায়দের [প্রসন্নকুমার রায়ের স্ত্রী] ট্যাব্লোর ধুম প'ড়েছে—প্রায়ই উপরে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ঘরে এ্যাকটিং হয়। আমার ওপর ভার দিয়েছেন দেবতাদের কার কি রকম রং—কি রকম অস্ত্র, পোষাক এই সব খোঁজ করতে।'

'আসছে সপ্তাহে মিসেস রায়দের ওখানে 'আমরা' একটা ট্যাব্লো করব। সেটা ঐ ট্যাব্লোর-ই imitation-এ parody করা হবে। আমি লিখেছি, আর কয়েকজন মিলে অ্যাক্ট করব।'

'গত শনিবার বোর্নমাউথে এসেছি। লণ্ডন থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। এখানে এসে খুব ভাল লাগছে, জায়গাটা ভারি সুন্দর।'
'...অনেকটা দার্জ্জিলিঙের কথা মনে হয়।'

'আজ আমাদের ফটোগ্রাফিক ক্লাবের ছবি প্রিণ্টের দিন। সমস্ত বিকাল আর সন্ধ্যা প্রিণ্ট করতে ব্যস্ত ছিলাম।'

'যুবক সমিতি [ব্রাহ্ম যুব সমিতি] নিয়ম মত হয় কি? আশা বাবুকে [আশাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়] আমার কথা মনে করিয়ে দিস্‌।'

'আজ মাঘোৎসবের জন্য ওয়ালডর্ফ হোটেলে [পার্টি] আছে—৩টার সময় আমাদের যেতে হবে—৪টাতে পার্টি।'

'পরশু, মঙ্গলবার এখানে Shrove Tuesday ছিল। সেদিন স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে আর ছেলেদের procession ইত্যাদি বেরোয়।...'

'দুপুর বেলা ছেলেগুলো সব নানা রকম সাজ করে Owens College থেকে procession করে বেরোল। একটা মোটর কারে প্রায় ১২/১৪টা ছেলে চড়েছে। একটা ছেলে maid সেজে গাড়ির ছাতে পিছন দিকে মুখ করে, পা ঝুলিয়ে বসেছে। আর তার পেছনে অত্যন্ত disreputable গোছের চেহারা করে একদল ঘণ্টা ক্যানেস্তারা ইত্যাদি নিয়ে band বেরিয়েছে। Maidটি একটি ঝাঁটা হাতে করে band conduct করছে।'

তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়, তিনি এই সময় টেনিস, তাস ও বিলিয়ার্ড খেলায় অংশ নিচ্ছেন, টেনিস ও বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতা দেখতে যাচ্ছেন। যাচ্ছেন বিভিন্ন মিউজিয়াম আর্ট গ্যালারি ও থিয়েটার দেখতে। ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে কুলদারঞ্জনের কাছ থেকে কলকাতার ক্রিকেট ম্যাচের খবর জানতে চাইছেন ও বিলেতের ক্রিকেট খেলা দেখার কথা বলছেন। [এইরকমই একটি ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন 'রণজি']। 'হিণ্ডন' বলে একটা জায়গায় প্লেন ওড়া দেখতে যাচ্ছেন [তখন সম্ভবত এয়ারোপ্লেন দেখা যত্রতত্র সম্ভব হত না] দল বেঁধে।

বাড়ি থেকে নানারকম জিনিস যেত, তার মধ্যে আছে আচার, মুড়ি, আমসত্ত্ব, গুড়, ভাজা মশলা, পাঁপড়, বড়ি ইত্যাদি। তাঁব চিঠি থেকে এসব খবব জানা যায়। যেমন ঃ

'আমার মশলা ফুরিযে গেছে, আর কিছু সুবিধামতন পাঠিয়ে দিও। সুপুরিই বেশি কবে—আর সব তেমন না হলেও চলে।'

'আচার, গুড়, সুপুরি, ডাল সব পেয়েছি। আচারটা ভারি চমৎকার লাগল।'

'মাকে বলিস আমসত্ত্ব পেয়েছি—খুব চমৎকার হয়েছে।'

কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রসঙ্গও আছে তাঁর চিঠিতে—যেমন কয়লা শ্রমিক ধর্মঘট বা সাফ্রাজেটি আন্দোলন। দুটি আন্দোলন প্রায় একই সময়ে ঘটেছিল ঃ

'এখানে Coal Strike আরম্ভ হয়েছে···কয়লা না থাকায় অনেক factory বন্ধ হয়ে আসছে। রেলওয়ে কোম্পানিরা ট্রেন অনেক কমিয়ে দিয়েছে।···'

সাফ্রাজেটি আন্দোলন নিয়ে লিখছেন ঃ

'আজ সপ্তাহখানেক হল Suffragetteদের উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। দল বেঁধে গিয়ে বড় বড় দোকানে কিম্বা Public Building-এর জানালার দামী কাঁচ ভেঙ্গে দেওয়া এদের কাজ···সমস্ত museum gallary সব বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে—পাছে কোনরকম damage করে।'

'আমাদের বাড়ি থেকে ৫ মিনি
ভদ্রলোকের মেয়ে তার মধ্যে এ
Jacob-এর স্ত্রী) তার জানব
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই সময় স্বা
'তখন মেয়েদের ভোটাধি
প্রতিমার দেখি এ বিষয়ে'
সংক্রান্ত সভাসমিতিতে
হয়ে গেছে অথচ প্রতিম
প্রাবল্যে অন্যান্য মহি
শার্সি ভেঙে জেল হাজতে .
ফিরলেন তাঁর মুখে বার্নার্ড শ সম্বন্ধে অ...
গেল।' ['পিতৃস্মৃতি', ১৩৭৩, পৃ. ১৩..

খানে সংগ্রহ করা যায়।
ও প্রতিভার পরিচয় তুলে
সেইসঙ্গে রবীন্দ্র-
ল। তিনি
তাঁর

'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৩২০ সালের (১৯১৩) বৈশাখ মাসে। সুকুমার তখন বিলেতে। তাঁর চিঠি থেকে জানা যায় সন্দেশের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, জীবজন্তু ও প্রাণীজগতের নানান তথ্য দেওয়া সচিত্র গ্রন্থের সন্ধান করছেন, ছোটদের পত্র-পত্রিকার নমুনা সংগ্রহ করছেন, সন্দেশে ছাপা যায় এমন ছবির বই জোগাড় করছেন।[৯]

সন্দেশে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযুক্তির শুরু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভবম হাজাম' [পরবর্তীকালে গল্পটি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল] গল্পের ইলাস্ট্রেশনের মধ্যে দিয়ে। ছবিসহ গল্পটি সন্দেশের শ্রাবণ, ১৩২০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। চিঠিতে এ সম্বন্ধে লিখছেন :

> 'সন্দেশের জন্য বুবার [কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়] গল্পটি এই সঙ্গে দিলাম। ওর ছবিটা আঁকতে ভয়ানক দেরী হয়ে গেল—মেইলের সময় যায়। ছবিটা আলাদা প্যাকেটে পাঠালাম।'

সন্দেশের প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্রনাথ পান লণ্ডনেই। নিয়মিত তাঁর হাতে সন্দেশ পৌঁছত। রবীন্দ্রনাথের পত্রিকাটি যে ভাল লেগেছিল সে কথাও আছে চিঠিতে :

> 'রবিবাবুর ওখানে সেদিন Launch-এর নেমন্তন ছিল—তিনি সন্দেশ পড়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। বলছিলেন তাঁর অবসর হলে সন্দেশের জন্য কিছু লিখবেন।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের তৃতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে প্রায় একবছর চার মাস কাটান বিদেশে। এর মধ্যে ৬ মাস তাঁর কাটে আমেরিকায়।

'দুপুর বেল

College থে ন কি বাঙালি জাতির ভাগ্যে এই সময়টি অতি গুরুত্ব-
প্রায় ১২/১' র্ব বিদেশ ভ্রমণে বেড়িয়ে প্রথমে লণ্ডনে পা দিয়েছিলেন
ছাতে পি , ভুলিপি সঙ্গে নিয়ে। যাওয়ার পথে জাহাজেই তাঁর এই গ্রন্থেব
অত বকাংশ কবিতা অনূদিত হয়েছিল। ইংলণ্ডে মূলত Rothenstein-
ই র সেখানকার প্রভাবশালী কবি ও সাহিত্যিকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়
সেখানকার পুরোধা সাংস্কৃতিক জগতের মানুষেরা রবীন্দ্র-কবিতায়
ধ হন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব-সম্পদের ঐশ্বর্য, তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী আকর্ষণ শক্তি—ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভাবুক সমাজকে নাড়া দিয়েছিল। এরপর বিদেশের বরমাল্য নিয়ে তিনি দেশে ফেরেন ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯১৩-তে।[১০]

ইংলণ্ডে থাকার সময়ই সুকুমার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। এই সময় প্রসেস-শিল্পে পাঠ গ্রহণ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় কাজ-কর্মের ফাঁকে রবীন্দ্র সাহিত্যচর্চায় সময় দিচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে দেশি-বিদেশি গুণী মানুষদের সামনে প্রবন্ধ পড়ছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একত্রে নানা জায়গায় যাচ্ছেন, [এর মধ্যে পার্লামেণ্টেও গিয়েছিলেন একবার] রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ রক্ষা করছেন।

সুকুমারের প্রবাস-জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটি এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ খ্রি.-এর ২৭ মে বোম্বাই থেকে 'সিটি অফ গ্লাসগো' জাহাজে ইংলণ্ডে পাড়ি দেন। সঙ্গে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা ও সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। তাঁরা ১৬ জুন ১৯১২ তারিখে লণ্ডনে পৌঁছন।[১১]

প্রথম দিকে তিনি থাকতেন সাউথ কেনসিংটনের কাছে একটি বাড়িতে। সুকুমারের ঠিকানা ২১নং ক্রমওয়েল রোড থেকে বাড়িটি খুব কাছে, '১ মিনিটের পথ'। পরে বাসস্থান স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়ায় উঠে যান Hampstead Heath-এর একটি বাড়িতে। সুকুমারের চিঠি থেকে জানা যায় গাছপালা ঘেরা এই জায়গাটা ছিল অতি মনোরম।

রবীন্দ্রনাথের লণ্ডনে আসার কয়েকদিনের মধ্যে সুকুমার তাঁর কাছে গিয়ে দেখা করেছেন। তারপর প্রায়ই যে তাঁদের মধ্যে কোন না-কোনভাবে যোগাযোগ হচ্ছে—এ কথাও সুকুমারের চিঠি থেকেই জানা যায়।

অক্টোবর (১৯১২) মাসে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা যান। সেখানে ছ'মাস কাটিয়ে ১৪ এপ্রিল, ১৯১৩ তারিখে ফিরে আসেন লণ্ডনে।

সুকুমারের চিঠিতে আমেরিকা যাবার আগে ও পরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও

নানা দিক থেকে তাৎপর্যময় যোগাযোগের বিবরণ এখানে সংগ্রহ করা যায়। দেখা যাবে এই তরুণ রবীন্দ্রানুরাগী বিদেশে রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরার কিছু কিছু কাজ করেছিলেন আপন উৎসাহেই—সেইসঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যেব একনিষ্ঠ অনুরাগী হিসেবেও ঃ

> 'রবিবাবু এখানে এসেছেন। সেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হল। তিনি বল্লেন তাঁদের ওখানে যেতে।'

> 'পরশুদিন [সম্ভবত ১৯ জুন, ১৯১২] Mr. Pearson তাঁর বাড়িতে আমায় Bengali Literature সম্বন্ধে একটা paper পড়বার নেমন্তন্ন (করেছিলেন)। সেখানে গিয়ে (দেখি) Mr. & Mrs. Arnold, Mr. & Mrs. Rothenstein, Dr. P. C. Ray [আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র] Mr. Sarbadhikary [দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী] প্রভৃতি অনেকে. তাছাড়া কয়েকজন অচেনা সাহেব মেম সব উপস্থিত।
>
> শুধু তাই নয় ঘরে ঢুকে দেখি রবিবাবু বসে রয়েছেন। বুঝতেই পারছিস আমার কিরকম অবস্থা। যা হোক চোখ কান বুজে পড়ে দিলাম। লেখাটার জন্য খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে। India office Library থেকে বইটই এনে material যোগাড় করতে হয়েছে। তা ছাড়া রবিবাবুর কয়েকটি কবিতা ('সুদূর', 'পরশপাথর', 'কুঁড়ির ভেতর কাঁদিছে গন্ধ' ইত্যাদি) অনুবাদ করেছিলাম।—সেগুলো সকলের খুব ভালো লেগেছিল।…
>
> ·Mr. Chesire আর Crammer Byng [North Brook Society আর 'Wisdom of the East' Series-এর Editor] খুব খুশি হয়েছেন। Mr. Byng আমাকে ধরেছেন আরও অনুবাদ করে দিতে, তিনি Publish করবেন। বলছেন ছুটিতে তাঁর সঙ্গে Country House-এ যেতে আর সেখানে বসে লিখতে।

> 'মঙ্গলবার [৯ জুলাই] রবিবাবুর ওখানে রাত্রে খাবার নেমতন্ন ছিল। Rothensteinও সেখানে এসেছিলেন—দুজনেই বল্লেন, আমি রবিবাবুর কয়েকটা poetry যা translation করেছি তা তাঁদের খুব ভাল লেগেছে—সেইগুলো এবং আরো কয়েকটা translate করে publish করবার জন্য বিশেষ করে বল্লেন।'

> 'আজ রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন—তাই রবিবাবু সন্ধ্যার সময় উপাসনা করবেন। রবিবার আমরা…ব্রিস্টলে যাব।'

রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে ছিলেন ১৬ জুন, ১৯১২ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ পর্যন্ত। এর মধ্যে বহুবার সুকুমারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছে।

আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর রবীন্দ্রনাথ একদিন 'রাজা' নাটকের অনুবাদ পাঠ করেন [১০ জুন, ১৯১৩]। সুকুমার সে আসরে উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ের যোগাযোগের কিছু বিবরণ সুকুমারের চিঠি থেকে সংগ্রহ করা যায় ঃ

> 'মে মাসে রবিবাবু আমেরিকা থেকে আসবেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য শুনলাম ল'ডনে খুব বড় রকমের আয়োজন হচ্ছে।'
>
> 'রবিবাবু আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন—কাছেই বাড়ী নিয়েছেন। আজ আর একটু পরেই তাঁর বক্তৃতা আছে—বক্তৃতা ঠিক নয়, তাঁর কি একটা drama-র translation পড়বেন। অনেক লোক আসবেন—Sir Herbert Beerbohm Tree Preside করবেন।'
>
> 'কাল Criterion Hotel-এ রবিবাবুর মস্ত reception দেওয়া হচ্ছে। গত সোমবার এখানের একটা ক্লাবে East & West Society-তে 'The Spirit of Rabindranath' বলে একটা পেপার পড়লাম। লোক মন্দ হয় নি—Quest কাগজের editor Mr. Mead (যিনি এখানে রবিবাবুর lecture সব arrange করেছিলেন)—তাঁর প্রবন্ধটা খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি সেটা Quest কাগজে ছাপছেন।'[১১]

আমেরিকা যাবার আগে অর্শের কারণে অসুস্থ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ল'ডনে ফিরে Caxton Hall-এ 'সাধনা' বক্তৃতা দেওয়ার পর তাঁকে শেষ পর্যন্ত রীতিমতো চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের জন্য রাজি হতে হ'ল। রবীন্দ্রনাথ এর জন্য Duchess Nursing Home-এ ভর্তি হলেন। অস্ত্রোপচার ও বিশ্রামের জন্য সেখানে দু'সপ্তাহ থাকলেন। সুকুমার এ সময় নার্সিং হোমে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে দেখতে গিয়েছিলেন ঃ

> 'রবিবাবু দু'সপ্তাহ নার্সিং হোমে ছিলেন। কয়েকদিন হ'ল সেখান থেকে এসেছেন। তরশুদিন আমরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম।'

অজিত চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের এই সময়ের কথা লিখেছেন ঃ

> '...ডাক্তারের বাড়ির নিকটবর্তী একটা নার্সিং হোমে-এ একটা ঘর ঠিক করে একদা রবিবারের অপরাহ্নে আমার আত্মীয় বন্ধুগণ আমাকে বিসর্জন দিয়ে চলে গেলেন। পরদিন সকালে সাড়ে ৯টার সময় আমাকে তিমিরান্ধ করে অপারেশন হয়ে গেল।'[১২]

উইলিয়াম রোটেনস্টাইনের (১৮৭২-১৯৪৫) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। রোটেনস্টাইন তখন এদেশে এসেছেন ভ্রমণার্থী হিসেবে।

এর পরের বছরই রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড যান এবং মূলত রোটেনস্টাইনের আগ্রহ ও প্রচেষ্টাতেই সেখানকার ভাবুক ও রসিক সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। রোটেনস্টাইনের বাড়িতেই ১৯১২ খ্রি.-এর ৩০ জুন গীতাঞ্জলির অনুবাদ পঠিত হয়।[১৩]

সুকুমারের চিঠিতেও রোটেনস্টাইনের প্রসঙ্গ আছে ঃ

> 'গত রবিবার এখানকার একজন প্রসিদ্ধ Painter (Mr. Rothenstein) এর বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানে চা'টা খেলাম। অতি ভাল মানুষ। India ঘুরে এসেছেন—কাজেই India সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হল।'…'প্রায় দু সপ্তাহ হল বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে একটা paper প'ড়েছিলাম—খুব অল্প লোক হ'য়েছিল। সেটা আরেকদিন পড়বার জন্য অনেকে অনুরোধ করছেন—Mr. Rothensteinও কি করে তার কথা শুনেছেন—তিনিও শুনতে চাচ্ছেন, বোধ হয় আর এক দিন পড়ব।'

উইলিয়াম উইনস্টানলি পিয়ারসনের (১৮৮১-১৯২৩) সঙ্গে লণ্ডনে আলাপ হয় সুকুমারের। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুরাগী পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে ও বহুশ্রেণীর মানুষের একান্ত প্রিয় এই মানুষটির কথা সুকুমার চিঠিতে লিখেছেন এইভাবে ঃ

> 'মিস্টার পিয়ারসন বলে একটি সাহেব (যাঁর কথা আগেও অনেকবার লিখেছি—যিনি ডাক্তার পি. কে. রায়ের জায়গায় কিছুদিন কাজ করেছিলেন) দিল্লী যাচ্ছেন। বোধ হয় খ্রীষ্টমাসের সময় কলকাতায় যাবেন—বেশ বাংলা বলতে পারেন আর মানুষ অতি চমৎকার। আমাদের বাড়ী যদি যান পাটিসাপ্‌টা কিম্বা কিছু খাইয়ে দিতে পারলে বড় ভাল হয়। এখানে তার মা থাকেন, বোধহয় ভাইবোনেরাও কেউ কেউ আছে ওখানে আমার নিমন্ত্রণ আছে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় পরিচয়ের দু বছর বাদে পিয়ারসনের অপূর্ব একটি রূপকধর্মী রচনা ['তারার স্বপ্ন'] ১৩২২, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সন্দেশে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পিয়ারসনের স্বল্পায়ু জীবৎকালে এটি সন্দেশে তাঁর একমাত্র রচনা। তখন উপেন্দ্রকিশোর জীবিত এবং তিনিই তখন সন্দেশের সম্পাদক।

স্বদেশে ফেরার আগে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কারো কারো সঙ্গে কণ্টিনেণ্ট ঘুরে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন সুকুমার। উপেন্দ্রকিশোরকে লিখেছেন ঃ

> 'রবিবাবুরা আজ না হয় কাল জার্ম্মানি ফ্রান্স প্রভৃতি জায়গায় বেড়াতে বেরোবেন—দ্বিজেন বাবু [ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র] তাঁদের সঙ্গে যাচ্ছেন। আমাকেও যাবার জন্য রবিবাবু বিশেষ করে বলেছেন। বিশেষতঃ এ

> রকম সুবিধামত করে দেখা আর হবে না। ২/৩ সপ্তাহ বাইরে থেকে লণ্ডনে ফিরব। তবে জোগাড় যন্ত্র এখনই করতে হচ্ছে।'

বিধুমুখীকেও একই কথা জানিয়েছেন আর একটি চিঠিতে ঃ

> 'আসছে সপ্তাহে হয়ত জার্ম্মানি থেকে চিঠি লিখব।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুকুমারের কণ্টিনেণ্ট ঘোরা হয়েছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে যাওয়া হয় নি—রবীন্দ্র-জীবনী সে ব্যাপারে পরোক্ষ সাক্ষ্য দেয়। সম্ভবত একত্রে পরিকল্পনা হয়েছিল বলে সুকুমারেরও যাওয়া হয় নি। দেশে ফেরার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহন ঘোষেব সঙ্গে লিভারপুল থেকে জাহাজে চাপেন ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ তারিখে।[১৪] ২৯ অগাস্ট, ১৯১৩ তারিখে লেখা চিঠির পরবর্তী প্রায় এক পক্ষকাল তাঁব কিভাবে কেটেছিল – তা জানা যায় না। তবে শারীরিক অসুস্থতার জন্য রবীন্দ্র-নাথের সে সময় কণ্টিনেণ্ট ঘোরা হয় নি।

দুবছর প্রবাসে কাটিয়ে সুকুমার রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহন ঘোষেব সঙ্গে 'City of Lahore' জাহাজে চেপে বোম্বাই-এ নামেন। বোম্বাই থেকে রেলে কলকাতা পেঁছিন ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ তারিখে। তত্ত্বকৌমুদী ১৬ আশ্বিন, ১৩১০ সংখ্যায় এই প্রত্যাবর্তনের সংবাদ প্রকাশিত হয় ঃ

> 'প্রত্যাগমন ঃ বিগত ২৯-এ সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংলণ্ড ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়াছেন।· শ্রীমান সুকুমার বায়চৌধুরী ও শ্রীমান কালীমোহন ঘোষ ইংলণ্ডে শিক্ষা সমাপন করিয়া এই সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।'

এই বিশেষ দিনটির কথা কালিদাস নাগের 'দিনলিপি'তে ধরা আছে এই ভাবে ঃ

> আজ প্রাচ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের যশোমুকুট মণ্ডিত হয়ে দেশে ফিরে এলেন। বেলা ৮টায় Mail পেঁৗছাল। Platform লোকে লোকারণ্য। ব্রজেনবাবু, হীরেনবাবু প্রভৃতি অভিনন্দিত করে নিলেন। আজই সন্ধ্যায় বোলপুর গেলেন উদ্দেশ্য ছুটির পূর্বে ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ।[১৫]

১ঃ C. U. Calendar, 1956, p. 633। ২ঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'সুকুমার রায়/জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি', "এক্ষণ" বার্ষিক সংখ্যা ১৩৯৩, পৃ. ২৫০। ৩ঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্বর্গীয় সুকুমার রায়', "সন্দেশ" আশ্বিন ১৩৩০। ৪ঃ 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র' ৩য় খণ্ড, সম্পা. সত্যজিৎ রায়, ১৯৮৯, পৃ. ১৬১-১৬২। ৫ঃ তদেব, পৃ. ৪০৮ ['গ্রন্থ পরিচয়' অংশ]। ৬ঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ..., পূর্বোক্ত, দ্র. ২৬. ১০ ১৯১১ তারিখে লেখা সুকুমারের চিঠি ঃ 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র' পৃ. ১৬৯। ৭ঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'উপেন্দ্রকিশোর ঃ শিল্পী ও কারিগর', "এক্ষণ" শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯১, পৃ. ১০২। ৮ঃ তদেব, পৃ. ৭১। ৯ঃ 'সুকুমার

সাহিত্য সমগ্র' ৩য় খণ্ড..., পৃ. ২৩৭, ৯৬ সংখ্যক চিঠি। ১০ঃ দ্র. [ক] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-জীবনী', ২য় খণ্ড : [খ] সৌরীন্দ্র মিত্র 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে', ১৯৭৭ ; [গ] অশ্রুকুমার সিকদার, 'রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন', ১৯৭৯। ১১ঃ লীলা মজুমদার, 'সুকুমার রায়', ১৩৭৬, পৃ. ১১৪। ১২ঃ 'পত্রাবলী' [অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, "দেশ" সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৮, পৃ. ২৩-২৪]। ১৩ঃ অশ্রুকুমার সিকদার..., পৃ. ১৩। ১৪ঃ তদেব, পৃ ৩৮। ১৫ঃ 'বিশ্বপথিক কালিদাস নাগ', ১৯৮৬, পৃ. ৫৪।

২

বিলেত থেকে ফেরার কিছুদিন পর সুকুমারের বিবাহ হয় ঢাকা নিবাসী জগচ্চন্দ্র ও সরলা দাসের কন্যা সুপ্রভার সঙ্গে। বিবাহের তারিখ ১৩ ডিসেম্বর, ১৯১৩। জগচ্চন্দ্র দাস সম্বন্ধে অল্পবিস্তর প্রসঙ্গ রজনীকান্ত গুহের 'আত্মচরিত'-এ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সেকালে এক্সট্রা অ্যাসিট্যাণ্ট কমিশনার। ঢাকার খ্যাতনামা সমাজসেবক ও ব্রাহ্ম কালীনারায়ণ গুপ্ত সুপ্রভার মাতামহ। সুপ্রভার মাতুলদের মধ্যে স্যার কে. জি. গুপ্ত (কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত) সেকালে ছিলেন একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। বিলেতে থাকার সময় সুকুমারের লেখা চিঠিতে কে. জি. গুপ্তের উল্লেখ রয়েছে। তিনি তখন বিলেতেই আছেন। কালীনারায়ণ গুপ্তের পুত্র ও জামাতাদের মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত। এই পরিবার সম্বন্ধে কৃষ্ণকুমার মিত্র 'আত্মচরিত'-এ লিখছেনঃ 'গুপ্ত মহাশয়ের [কালীনারায়ণ গুপ্ত] বৃহৎ পরিবার, চারি পুত্র ও ছয় কন্যা।' 'স্যার কে. জি. গুপ্ত, গুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে ভারত সচিবের কাউন্সিলের সভ্যপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সিভিল মেডিকেল অফিসার ছিলেন। তৃতীয় পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার জামাতাদের মধ্যে ডাক্তার রামপ্রসাদ সেন [কবি অতুলপ্রসাদের পিতা] চিকিৎসক, জগচ্চন্দ্র দাস একস্ট্রা এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার, শশিভূষণ দত্ত মহাশয় গভর্ণমেণ্ট কলেজের প্রিন্সিপাল, সত্যরঞ্জন দাস ব্যারিস্টার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য সুবিখ্যাত ডাক্তার।'[১]

সুপ্রভা ঢাকা থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর, ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য ও সংগঠক ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ও তাঁর স্ত্রী সুবালা আচার্যের কাছে (তাঁর মেসোমশাই ও মাসীমা) থেকে বেথুন কলেজে পড়তেন।[২]

পাত্রী পছন্দ করা সম্বন্ধে একটি কৌতুকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লীলা মজুমদার লিখছেনঃ 'সুকুমারের বিবাহ সম্বন্ধে একটি গল্প শোনা যায় ; কিরকম মেয়ে তাঁর ভালো লাগে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি নাকি [সুকুমার]

বলেছিলেন এমন মেয়ে যে গান গাইতে পারে আর যাকে রসের কথা বুঝিয়ে বলতে হয় না।'[৩] কুলদারঞ্জনের কন্যা মাধুরীলতার স্মৃতিকথায় পাত্রী দেখতে যাওয়ার সরস বর্ণনা আছে: 'কনে দেখার আসরে সুপ্রভাকে বলা হল, একটি গান শোনাও। [সুপ্রভা] চমৎকার গান করতেন। খুবই ভাল গাইতেন। তিনি তখনও পর্যন্ত জানতেন না যে আমাদের দাদার [সুকুমার] ডাক নাম 'তাতা'। গান ধরলেন 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ।' আমরা যারা তখন অল্প বয়সের, বলাবলি করছি, ঐ দেখ তাতা বলছে, আবার তাতা বলছে। নতুন বৌদি হবে তাই দাদার নাম তাতা বলছে। বৌদি তো পরে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়েছিলেন।'[৪] সুকুমারের বিবাহ হয়েছিল ১৬নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের 'রাজমন্দির' বলে একটা বাড়িতে —সম্ভবত ভাড়া নিয়ে। এখন যেখানে বিদ্যাসাগর কলেজ হোস্টেল হয়েছে, সেখানে একটি খোলা মাঠ ছিল। লোকে বলত 'পান্তীর মাঠ'। পান্তির মাঠেব ঠিক পরেই 'রাজমন্দির' বাড়িটি।[৫] সুকুমারের বিবাহের ঠিক দুসপ্তাহ পর ২৬ ডিসেম্বর, ১৯১৩ তারিখে সুকুমারেব ছোটবোন শান্তিলতারও বিয়ে হয এখানেই।[৬]

সুকুমার সুপ্রভার বিবাহ অনুষ্ঠানের কিছুটা বর্ণনা ধরা আছে সীতাদেবীর দিনলিপিতে: 'দিন-চার আগে গত শনিবার একটা বেশ remarkable বিয়ে হয়ে গেল। বর শ্রীসুকুমার রায় কনে শ্রীমতী সুপ্রভা দাস (টুলুদি)। দুজনেই আমার বন্ধু স্থানীয়, কাজেই যাবার জন্য খুব উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম। বিয়ের বাড়িতে গিয়ে ত হাজির হলাম।'

'…বিয়ের registration টা উপরেই হয়েছিল, তারপর বরকনেকে নীচে নামাবার যোগাড় হচ্ছে এমন সময়ে এক ব্যাপারে সকলের মন হঠাৎ বর-কনের দিক থেকে অন্যদিকে চলে গেল। কি ব্যাপার? বিয়ের সময় হাততালি দেওয়াটা তো নিয়ম নয়? একটু ঝুঁকে পড়ে দেখলাম যে, রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে আসছেন, সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। তিনি যে আসবেন তা জানা ছিল না, শুনলাম সুকুমার বাবুর বিয়েতে উপস্থিত থাকবার জন্যই তিনি শিলাইদহ থেকে এসেছেন। এতবড় honour কিন্তু আশাতীত।

প্রতিমা [রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী] এসে আমার পাশেই বসেছিলেন, বিয়ে শেষ হবার পর তাঁর সঙ্গে ঘুরলাম খানিকক্ষণ। বরকনে নিয়ে খুব আলোচনা চলতে লাগল। কনে অবশ্য মাথা নীচু করে পুরোপুরি কনের মতনই বসে-ছিলেন। বর খুব dignified ভাবে নিজের নিজের বক্তব্য বলে গেলেন, আচার্যকে আর কষ্ট করে মন্ত্র পড়াতে হল না।'[৭]

সুপ্রভাকে রবীন্দ্রনাথ খুবই স্নেহ করতেন। সংগীতে তাঁর অধিকার ও সুকণ্ঠের জন্য খ্যাতি ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা অনেক গান তাঁকে স্বয়ং

শিখিয়েছিলেন। 'শিল্পীর চোখ ও হাত ছিল সুপ্রভার, রসবোধ ছিল প্রচুর, কিন্তু মানুষটি ছিলেন গম্ভীর, কর্তব্যপরায়ণা, অনলসভাবে কাজ করে যেতেন।'[৮]

১ঃ দ্বিতীয় সং ১৩৮১, পৃ. ৭৭ ২ঃ শান্তা দেবী. 'পূর্বস্মৃতি', ১৯৮৩, পৃ. ৬৩ ৩ঃ লীলা মজুমদার 'সুকুমার রায়'…, পৃ. ৩১-৩২ ৪ঃ বিষ্ণু বসু সম্পা. 'সুকুমার রায়ঃ শিল্প ও সাহিত্য', ১৯৮৯. পৃ. ১৪-১৫। ৫ঃ 'কলিকাতা-দর্পণ'…, পৃ. ৪৬ ৪৭। ৬ঃ সুধীর-কুমার চৌধুরী, 'তাতাবাবু', "দৈনিক কবিতা" ২৫ বৈশাখ, ১৩৮০। ৭ঃ তদেব ৮ঃ লীলা মজুমদার, 'সুকুমার, রায়'. পৃ. ৩২

৩

বিলেত থেকে ফেরা এবং ২২নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে ১০০ নম্বর গড়পার রোডে উঠে যাওয়ার মধ্যে সুকুমারের লেখালেখির চর্চা ধীরে ধীরে বেড়েছে। ১৯১৪-র ২২ জানুয়ারি তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সহকারী সম্পাদকও হয়েছেন। সেই বছর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রায় প্রতি অধিবেশনেই উপস্থিত থেকেছেন। এই সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হল, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ তারিখে রামমোহন লাইব্রেরীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে নোবেল প্রাইজ পাওয়া উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ব্রজেন শীল, নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রমুখ অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি। শিবনাথ শাস্ত্রী হয়েছিলেন সভাপতি। সুপ্রভা এই সভায় একটি গান গেয়ে শোনান। কালিদাস নাগ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ রবীন্দ্রানুরাগী তরুণগোষ্ঠীর মধ্যে সুকুমারও উপস্থিত ছিলেন।[১] এই বছর মার্চ মাসের 'Modern Review' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় অবনীন্দ্রনাথের মূর্তিতত্ত্ব বিষয়ক [১৩২০ সালের পৌষ ও মাঘ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত] একটি প্রবন্ধের অনুবাদ। গুরুত্বপূর্ণ এই প্রবন্ধটি 'Indian Icongraphy' নামে অনুবাদ করেছিলেন সুকুমার। এই বছরই আষাঢ় (১৩২১ সন) সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় একটি দার্শনিক প্রবন্ধ 'চিরন্তন প্রশ্ন'। এই বছর 'আশ্বিন' সংখ্যার 'প্রবাসী'তে দেখা যাচ্ছে সুকুমারের দুটি লেখা প্রকাশিত হয়েছেঃ 'ভাবুক সভা' নামক ক্ষুদ্র ব্যঙ্গ নাটিকা এবং 'শিল্পে অত্যুক্তি' নামক শিল্পবিষয়ক সচিত্র প্রবন্ধ। 'সন্দেশ'-এ তাঁর লেখালেখি ও ছবি আঁকার পরিমাণও বেড়েছে।

'ভাবুক সভা' সম্ভবত ১৯১৫ সালে লেখা শব্দকল্পদ্রুমের পূর্বরূপ। শব্দ, অর্থ, এদের পারস্পরিক সম্পর্ক আবার তথাকথিত ভাবুকদের ভাবুকতা সুকুমার একই সঙ্গে আলোচনার ও সমালোচনার বিষয়বস্তু করে তুলেছেন।

'ভাবুক সভা' রচনাটি সচিত্র। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত লেখাটির সঙ্গে সুকুমারের একটি অনবদ্য ছবি আছে। তাতে দেখা যাচ্ছে জ্যোৎস্না রাতে জলের ওপর একটি ঝুঁকে পড়া ডালে ভাবুকদাদা তাঁর কবিতার খাতা ও কলম হাতে খাতার দিকে নিমগ্নচিত্তে চেয়ে বসে আছেন। তাঁর উড়নির একাংশ জলে ঝুলে পড়েছে, অন্য অংশ হাওয়ায় উড়ছে। সম্ভবত সেকালের কোনো অতিভাবুক গোষ্ঠীকে ঠাট্টা করে এই রচনা।

একই সংখ্যায় সুকুমারের শিল্প-বিষয়ক একটি সচিত্র প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই প্রবন্ধটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

'শিল্পে অত্যুক্তি' প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি বা আতিশয্যের মূল্যায়ন। শিল্পী নিছক চাক্ষুষ বাস্তবকে নিয়ে সন্তুষ্ট নন। নিজের মনের কথাকেও তিনি ব্যক্ত করেন। এর ফলে চিত্রে চাক্ষুষ বা সাধারণ বাস্তবতার অতিরিক্ত কিছু সৃষ্টি হয়। এই অতিরিক্ত কিছুকেই সুকুমার বলেছেন 'অত্যুক্তি'। ফিউচারিস্ট, কিউবিস্ট, সুররিয়ালিস্ট, এক্সপ্রেশানিস্ট—এইসব মতবাদে বিশ্বাসী শিল্পীদের আঁকায় এই অত্যুক্তিরই প্রকাশ ঘটেছে।

প্রবন্ধটিতে বিভিন্নশ্রেণীর অত্যুক্তির উদাহরণ হিসেবে ব্রাঁকুসির ভাস্কর্য, সেভেরিনি, কার্লোকারা, রসোলা, পাবলো পিকাসোর তৈল-চিত্রের মোট ছ'টি ফটোগ্রাফ মন্তব্যসহ ছাপান হয়েছে। পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস ও তত্ত্বে সুকুমারের চর্চা ও অধিকার প্রমাণ করে এই প্রবন্ধটি।

আলোচনা প্রসঙ্গে যে-সব পরিভাষা তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাও লক্ষ্য করবার মতো। যেমনঃ সুকুমারের হাতে 'ফিউচারিজম্' হয়েছে ভবিষ্যবাদ, কিউবিস্টঃচতুষ্কোণবাদী, অ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ ফর্মঃ অব্যক্তরূপ, ফান্ডামেন্টাল কালারঃ মৌলিকবর্ণ ইত্যাদি। 'ভারতীয় চিত্রকলা' বিতর্কে সুকুমার যেমন ভারত-শিল্পের নামে বাড়াবাড়িকে সমালোচনা করেছিলেন, এখানেও ইউরোপের নব্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িও তার তির্যক মন্তব্য এড়াতে পারে নি।

প্রবন্ধে ছাপা ছবিগুলির নমুনা সম্ভবত সুকুমারের নিজের সংগ্রহের। বিলেতে থাকার সময় একটি শিল্প-প্রদর্শনী দেখার অভিজ্ঞতা এটি রচনায় সুকুমারকে সাহায্য করেছেঃ '১৯১২ সনেই চিত্রসমালোচক রজার ফ্রাই-এর উদ্যোগে লন্ডনে পোস্ট-ইম্প্রেসিনিস্ট ছবির প্রদর্শনী হয়। এর অল্প কিছুদিন পরেই প্রবাসীতে…লেখা 'শিল্পে অত্যুক্তি' প্রবন্ধ যে এই প্রদর্শনী দেখার ফল তাতে সন্দেহ নেই। এই বিশেষ গোষ্ঠীর শিল্পীদের উল্লেখ এবং সেই সঙ্গে ফিউচারিজম্, এক্সপ্রেশিনিজম্ ইত্যাদি নব্যরীতির উল্লেখ বাংলা প্রবন্ধে এই প্রথম।'[২]

এই সময় সুকুমার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। বিতর্কটির বিষয় সংক্ষেপে বলা যায় 'ব্রাহ্মরা হিন্দু কিনা'।

'ব্রাহ্মরা হিন্দু কিনা'—এটি ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি পুরানো বিতর্ক। বিতর্কটির জন্ম হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে আদম-সুমারি বা লোক-গণনাকে কেন্দ্র করে। সেই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মরা হিন্দুই একথা কথা জোর দিয়ে প্রমাণ করেন। রাজনারায়ণ বসু এ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনাও করেন। রবীন্দ্রনাথও বিভিন্ন সময়ে ব্রাহ্মরা যে হিন্দু এই মতকে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন।

এই বিতর্কটির পুনরাবির্ভাব ঘটে ১৯১৪ সালে। এই বছর ৩০ এপ্রিল সংখ্যার নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের মুখপত্র (সাপ্তাহিক) The world and the new dispension'-এ অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে নিরঞ্জন নিয়োগী বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একীকরণের প্রস্তাব প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করেন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজকে এই তালিকার বাইরে রাখেন। তাঁর যুক্তি ছিল, আদি ব্রাহ্মসমাজের সদস্য সংখ্যা বেশি নয়, প্রচারকেরও অভাব আছে ; তাছাড়া আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিরা হিন্দুসমাজের খুব নিকট সংস্পর্শে আছেন।

অজিত চক্রবর্তী এই বছরের (১৩২১) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এ সম্পর্কে আপত্তি জানান এবং আদি ব্রাহ্মরা কেন নিজেদের হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন, তাও দেখান। সুকুমার ভাদ্রসংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে অজিত চক্রবর্তীর যুক্তি ও প্রতিপাদ্যের বিরোধিতা করেন। সুকুমারের প্রবন্ধের পাশেই ওই সংখ্যায় অজিত চক্রবর্তীর প্রত্যুত্তর 'প্রতিবাদের উত্তর' প্রকাশিত হয়। এই বিতর্কের জের হিসেবে সুকুমারের আরো দুটি সমালোচনার সমালোচনা প্রকাশিত হয় আশ্বিন-কার্তিক যুগ্ম সংখ্যা ও পৌষ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে (১৩২১ বঙ্গাব্দ ; ১৮৩৬ শকাব্দ)। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অজিত চক্রবর্তীর প্রত্যুত্তর সুকুমারের আলোচনার সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রবীণ ব্রাহ্ম গুরুচরণ মহলানবিশ এই বিতর্কে যোগ দিয়ে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'প্রতিবাদপত্র' লেখেন। জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিও এই বিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন (দ্র. তত্ত্ববোধিনী ; শ্রাবণ, ১৮৩৬ শকাব্দ)। পৌষ সংখ্যায় সুকুমারের চিঠি এবং অজিত চক্রবর্তীর প্রত্যুত্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিতর্কটি আপাতভাবে স্থগিত থাকে।

অজিত চক্রবর্তীর মূল বক্তব্য ছিল ঃ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ হিন্দুসমাজেরই আদর্শ। ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠরূপ। তাঁর এই বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের অনুসারী। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মূলত এই কথাই প্রকাশ করেছেন।

সুকুমার ব্রাহ্মরা হিন্দু কি না এই সমস্যাটিকে গুরুত্ব না দিয়ে সমস্যাটিকে

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন। তাঁর মতে, 'আপনাকে হিন্দু বলিতে পারিলেই যে হিন্দুত্বের সংস্কারটা প্রকৃত হিন্দুত্ববোধে প্রমাণ হয় না হিন্দু সমাজই তার প্রমাণ।' আদি ব্রাহ্মসমাজের অনেকে যে সাফল্য দেখিয়েছেন তার কারণ 'আদি সমাজ আপনাকে হিন্দু বলিতেছে'—অজিত চক্রবর্তীর এই মতকে সুকুমার অস্বীকার করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে অজিত চক্রবর্তীর শিল্প ও জাতীয়তা, দেশাত্মবোধ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গগুলিও সুকুমার তীক্ষ্ন যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছিলেন—যদিও এর ফলে সে তর্কের মীমাংসা হয়েছিল, একথা বলা যায় না।

এর প্রায় দু'বছর পর মান্ডে ক্লাবেও এই নিয়ে দু'দিন আলোচনা হয়েছিল [২১. ২. ১৯১৬ ও ২৯. ২. ১৯১৬ তারিখে]। কিন্তু সেখানেও তর্কটি অমীমাংসিত থেকে যায়।[৩]

১ : দ্র "তত্ত্বকৌমুদী", ১৬ শ্রাবণ, ১৩২৪। ২ : সত্যজিৎ রায়, 'ভূমিকা', "বিলেতের চিঠি ও অপর একটি" "এক্ষণ" শারদীয় ১৩৮৯, পৃ. ১১৪। ৩ : পাঠ ভবন আয়োজিত 'সুকুমার মেলা' স্মারক গ্রন্থ [১৬-২০ ডিসেম্বর ; '৮৭] : শিশিরকুমার দত্তের নোট বই-এর অংশ বিশেষ।

চতুর্থ অধ্যায়

১৯১৪— ১৯২১

প্রসঙ্গ

১ ঃ ১০০ নম্বর গড়পার রোড ২ ঃ মান্‌ডে ক্লাব
৩ ঃ বিচিত্রা ক্লাব
৪ ঃ 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই'
৫ ঃ ফ্রেটারনিটি

১

'১৯১৪ সন শেষ হতেই আমরা ১০০ নং গড়পার রোডে আমাদের নতুন বাড়িতে উঠে গেলাম। এই বাড়িটি বাবা [উপেন্দ্রকিশোর] নিজের আঁকা নক্শা আর নিজের পরিকল্পনা অনুসারেই তয়ের করিয়ে নিয়েছিলেন। এক-তলার সামনের (উত্তরের) ঘরগুলোতে আফিস আর ছাপাখানা ছিল। পেছনের (দক্ষিণের) অংশে খাবার ঘর, স্নানের ঘর, রান্নাঘর এই সব ছিল। দোতলায় সামনের অংশে হলের মতন (hall) লম্বা ঘরে ফটোগ্রাফির আর ব্যবসার অন্য কতকগুলো কাজ হত। ছাপাখানা ঘরটাও হলের মতন লম্বা ছিল। দোতলার পেছনের দিকে থাকবার ঘর আর স্নানের ঘর। তেতলায় ছাদ আর ঘর। বাড়ির দক্ষিণে অনেকখানি জমি ছিল।'[১] নতুন বাড়িতে উঠে এলেও সম্ভবত তখনো সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। কারখানা ইত্যাদির কিছু অংশ এবং সন্দেশের কার্যালয় কিছুদিন পর্যন্ত সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতেই ছিল।[২]

১০০নং গড়পার রোডের বাড়িতে সম্ভবত ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের একেবারে শেষের দিকে সুকুমারের মধ্যম ভ্রাতা সুবিনয় রায়ের বিবাহ হয় মধ্য-প্রদেশ 'চান্দা' শহর নিবাসী ডাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর কন্যা পুষ্পলতার সঙ্গে।[৩] এই বাড়িতেই ১৯১৫ সালের ২০ ডিসেম্বর উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হয়। মানডে ক্লাবের বহু বৈঠক হয়েছে এই বাড়িতেই।

মানডে ক্লাবের জন্মদিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ২১ আগস্ট, ১৯১৫ তারিখটি। ক্লাবের বার্ষিক বিবরণী বা ক্লাবের জন্মদিন পালনের নিমন্ত্রণ-পত্রে এই তারিখটি পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম অধিবেশনের স্থান হিসেবে নির্দেশ করা হয় অমল হোমের ৬৪ সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ি, সময় বিকেল সাড়ে চারটে।

এর আগে, সম্ভবত ৩১ জুলাই, ১৯১৫ তারিখে এই ক্লাবের পরিকল্পনা পাকা হয় অজিত কুমার চক্রবর্তীর ৭ নম্বর বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটের ঘরে। কালিদাস নাগ তাঁর ড্রায়েরিতে লিখেছেন ঃ

'৩১. ৭. ১৯১৫

বিকেলে Historical Society সেরে অজিতদার বাড়ি [অজিত কুমার চক্রবর্তী] আমাদের 'মণ্ডা ক্লাবের' উদ্বোধন করে রাত ১০টায় বাড়ি ফেরা।'[৪]

অজিত চক্রবর্তীর বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটের ঘরে যে মানডে ক্লাবের উদ্বোধন হয় এ কথা ক্লাবের বয়ঃকনিষ্ঠ সদস্য হিরণকুমার সান্যালও উল্লেখ করেছেন ঃ 'ইতিমধ্যে ১৯১৫ সাল আন্দাজ অন্য একটি সূত্রে সুকুমার রায়ের সঙ্গে আমার একটু

ঘনিষ্ঠতা হল। কালিদাস নাগ তখন আমার অন্যতম অভিভাবক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'আমাদের একটা সমিতি করবার কথা হচ্ছে, যদিও তুমি খুব ছেলেমানুষ তবু তোমাকে সমিতির সভ্য করা হবে। সোমবার সোমবার সভা হবে। তোমার বাড়ির কাছেই। যদিও প্রথমে সমিতির কোন নাম দেওয়া হয় নি কিন্তু সোমবার মিটিং হত ব'লে নাম দাঁড়িয়ে গেল 'মানডে ক্লাব'। আমি তখন ঝামাপুকুরের গলিতে থাকতাম। কাছেই বেচু চাটুজ্যের স্ট্রীটে সতীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে শান্তিনিকেতন ছেড়ে এসে অজিত চক্রবর্তী মহাশয় রয়েছেন।··

ঐ বাড়িতে পত্তন হ'ল মানডে ক্লাবের। শিশিরকুমার দত্ত ওরফে খোদনবাবু হলেন সম্পাদক। চার আনা করে মাসে চাঁদা।· গুটি কয়েকজন লোক নিয়ে আরম্ভ পরে সদস্য সংখ্যা অনেক বেড়েছিল। সূত্রপাত ওখানে হলেও অল্প দিনের মধ্যেই তাতাদার গড়পারের বাড়িতেও হল অধিবেশন, খোদনদার বাড়িতে হল; তারপর ঘুরে ঘুরে হতে লাগল এক-একজন সভ্যের বাড়িতে।[৫]

সোমবার সোমবার আসর বসত বলে নাম মানডে ক্লাব, আবার সদস্যদের খাদ্য-প্রীতির জন্য অন্য নামও প্রচার হল। যেমনঃ মণ্ডা ক্লাব বা মণ্ডা-সম্মিলন, সুকুমার দিলেন 'খায়ত খায়'। আবার কেউ কেউ একে Literary and Gastronomical Club'ও বলতেন।'[৬]

ক্লাবের নানারকম রিপোর্ট, বিবরণী, আজগুবি অডিট ইত্যাদি ছাপা হত। প্রথম বছরের বার্ষিক বিবরণী ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যানুয়েল রিপোর্ট তাতে দেখা যাচ্ছে সভ্য-সংখ্যা উনিশ জন। ধীরে ধীরে এই ক্লাবের সভ্য-সংখ্যা অন্তত আঠাশ জনে এসে দাঁড়ায়। এঁরা হলেনঃ কালিদাস নাগ, গিরিজাশঙ্কর রায়-চৌধুরী, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অজিত কুমার চক্রবর্তী, হিরণ কুমার সান্যাল, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, অমল হোম, শিশির কুমার দত্ত, সুনীল কুমার গুপ্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, প্রশান্ত কুমার মহলানবীশ, এস. সি. সেন, অতুল প্রসাদ সেন, সুবিনয় রায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (জংলী গাঙ্গুলী) জীবনময় রায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশ কুমার শর্মা, কিরণ কুমার বসাক, হিমাংশুমোহন গুপ্ত—প্রমুখ। এঁদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে স্বনামধন্য পুরুষ—স্বক্ষেত্রে কম-বেশি যশ অর্জন করেছিলেন অনেকেই। অতুলপ্রসাদকে মানডে ক্লাবের সদস্য করার মূলে ছিলেন শিশির কুমার দত্তঃ 'অতুলপ্রসাদের মাসতুতো ভাই শিশির কুমার দত্ত ছিলেন মানডে ক্লাবের সেক্রেটারি। একদিন এসে অতুলপ্রসাদকে ধরলেন, ভাইদাদা, আমাদের মণ্ডা ক্লাবের সভ্য হতে হবে তোমায়।'[৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই ক্লাব ছাড়াও ২২ নম্বর

সুকিয়া স্ট্রিটের 'ভারতী' পত্রিকার আড্ডার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'ভারতী'র আসরে সুকুমারও যেতেন।[৮] মান্‌ডে ক্লাবের তৃতীয় বার্ষিক বিবরণীতে তাঁর নাম পাওয়া যাচ্ছে। তিনি এই ক্লাবকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'আমাদের শান্তি-নিকেতন' গানের অনুকরণে একটি গানও লিখেছিলেন। গানটিতে ক্লাবের পুরো স্পিরিটটাই ধরা পড়ে ঃ

মণ্ডা-সম্মিলন

(সুর "আমাদের শান্তিনিকেতন")

আমাদের মণ্ডা সম্মিলন !
আরে না—তা' না, না—
আমাদের Monday-সম্মিলন।
আমাদের হল্লারই কূপন !
তার উড়ো চিঠির তাড়া
মোদের ঘোরায় পাড়া পাড়া,
কভু পশুশালে হাসপাতালে আজব আমন্ত্রণ।
(কভু কলেজ ঘাটে ধাপার মাঠে ভোজের আকর্ষণ।)
মোদের চারুবাবুর দধি
মোদের কারু ঘোলের নদী
মোদের জংলী ভায়ার সরবতে মন মাতাল অদ্যাবধি।
মোদের আলোচনার রীতি
দেশে জাগায় বিষম ভীতি
কভু ভেয়ার হারেন উঁকি মারেন, ভ্যাম্বেরী, ভিলন !
মোদের গানের বিপুল বেগে
পাড়া আঁৎকে ওঠে জেগে,
ঢিল ছুঁড়িতে শুরু করে বেজায় রেগে মেগে।
মোদের নাচ যদি পায়, তবে
কি যে হয় শোনো তা সবে,—
নাগ বাসুকীর ঘাড় খসে যায়, হয় ভূমিকম্পন !
(নাগ কালিদাস হয় কাবু হায়, পায় দশা খোদন !)
মোরা হপ্তা বাদে জুটি
সবাই হাঁপিয়ে ছুটোছুটি,
রাধাবল্লভে মন নেই কো, রাধাবল্লভী বেশ লুটি।
মোদের কালোর সঙ্গে সাদায়
এই যে মিলিয়েছে দই কাদায়,

মোটার সঙ্গে কাহিলকে ভাই করেছে বন্ধন !
আমাদের মণ্ডা সম্মিলন !

২১ আগস্ট, ১৯১৮
মণ্ডা-সম্মিলনের তৃতীয় জন্মদিন "[৯]

মাঝে মাঝে ক্লাবেব সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় সদলে বেড়াতে যেতেন। এ রকম ভ্রমণ হয়েছিল শিবপুরে, গোবরডাঙ্গায়, কোলাঘাট, বরাহনগব, শান্তি-নিকেতন ইত্যাদি জায়গায়। এ ব্যাপারে মজার নিমন্ত্রণ-পত্রও ছাপা হত সুকুমাবেব প্রেসে। যেমন ঃ

মোচ্ছব

আগামী রবিবার ২৫ মে পূর্বাহ্ন ৯-১৫ ঘটিকায়
শিয়ালদহ ২নং রোয়াক মঞ্চ হইতে
বাষ্পীয় শকট আরোহণপূর্বক
গোবরডাঙ্গা প্রয়াণ।

আপনি না আসিলে জমবে না

অথবা,

"রবিবার ১০ই চৈত্র
প্রফেসর সুরেন মৈত্র
আবাহন করে সবে
শিবপুর আপন ভবে।

মহাশয় সময় বুঝে
চাঁদপালে জাহাজ খুঁজে
চড়িবেন যেমন রীতি
নিবেদন সাদর ইতি—"

* 2·30 P, M.[১০]

এগুলি কার রচনা অনুমান করা নিতান্ত অসম্ভব নয়।।

মান্‌ডে ক্লাবের আলোচিত ও পঠিত বিষয়গুলি ছিল বিচিত্র। লঘু-গুরু যে-কোনো প্রসঙ্গে আলোচনা, প্রবন্ধ-পাঠ ইত্যাদি হত। যথা ঃ কালিদাসের Geography (আলোচক ঃ কালিদাস নাগ, তারিখ ঃ ২৪. ৭. ১৯১৬); Nietzsche (গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ঃ ১৭. ১. ১৯১৬); রামমোহন রায় তান্ত্রিক ছিলেন কিনা (গিরিজাশঙ্কর ঃ ৩০. ৫. ১৬); Turgenev's Novels

(দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র : ৬. ৮. ১৭); Jute Industry (অজ্ঞাত : ৮. ১০. ১৭); Unintelligible of "If P then Q" (প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ : ২৬.২.১৭)।[১১]

শেষোক্ত প্রবন্ধটি সম্বন্ধে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রহস্যচ্ছলে লিখেছেন : '...মধ্যে মধ্যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাও হইত, যাহার মর্ম সকলের বোধগম্য হইত না। আমার এরূপ একটি ঘটনা বেশ মনে আছে। তখন ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ সবেমাত্র সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনার আরম্ভ করিয়াছেন। উহার রস আমাদের ন্যায় অভাজনের কাছে পরিবেশনের উদ্দেশ্যে আমারই গৃহের অধিবেশনে "ইফ্ পি দেন কিউ" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে নাকি সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তি লইয়া আলোচনা ছিল। সম্ভবতঃ তাহা গভীর অনুশীলনের ফল, কিন্তু আমরা অনেকেই তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না।'[১২]

সুকুমার মানডে ক্লাবে স্বরচিত একাধিক প্রবন্ধ নাটক ইত্যাদি পাঠ করেছেন, তার অধিকাংশ তাঁর জীবদ্দশায় 'প্রবাসী' ইত্যাদিতে মুদ্রিতও হয়েছে। যেমন :

৬. ১২. ১৫ তারিখে	: Aesthetic Superstitions
৩. ৪. ১৫	: Function of Art
৬. ৮. ১৬	: "টাট্কা নূতন নাটক"
১৩. ৮. ১৭	: "চলচিত্ত চঞ্চরী"
১. ৭. ১৮	: "ক্যাবলের পত্র"
১৪. ১. ১৮	: "জীবনের হিসাব"
৮. ৪. ১৮	: "দৈবেন দেয়ম"[১৩]

এই ক্লাবের বিবরণী থেকে জানা যায় ৪ জুলাই, ১৯১৭ এবং ২২ এপ্রিল, ১৯১৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে ক্লাবের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। অতুলপ্রসাদ সেনের লক্ষ্ণৌ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে "Fare well" হয়েছিল ১৯১৭-র ২৫ ফেব্রুয়ারি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এর কিছুদিন পর তাঁর একটি কবিতা-ও সন্দেশের সূচনা-পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল। ["বাতাসের গান" (মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে) : পৌষ সংখ্যা, ১৩২৫]। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি' পাওয়া উপলক্ষ্যে 'ডিগ্রি ভোজ' হয় ৩০ জুলাই, ১৯১৭ তারিখে।

কম বেশি চার বছর মানডে ক্লাব চলেছিল। সম্ভবত ১৯১৯ সালের শেষের দিকেই এর ধীরে ধীরে সমাপ্তি ঘটে। এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে : 'মানডে ক্লাব কিছুদিন পর উঠে গেল। সভা করে ঠিক হয় নি, আপনা থেকেই যেন উঠে গেল।[১৪] এর নানা কারণ অনুমান করা যায়। ১৯১৯-এর পর সুকুমার রায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তরুণ-গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন। এর কিছুদিন আগে এই ক্লাবের সভ্য অজিত কুমার চক্রবর্তীর মৃত্যু

সুকুমারসহ ক্লাবের সদস্যদের গভীর আঘাত দিয়েছিল। ক্লাবের উৎসাহী সভ্য ও অনারারি সেক্রেটারি [সুকুমারের ভাষায় অনাহারী সম্পাদক] শিশিরকুমাব দত্তের বিহার প্রস্থান এবং কোনো কোনো সদস্যের বিদেশ যাত্রার [যেমন সুনীতিকুমার ও কিরণশঙ্কর রায়] কারণকেও এর সঙ্গে যুক্ত করা যায়। সুনীতিকুমার নিজেই লিখছেন : **'I left for Europe in 1919 for the three years stay and study in London and then Paris and other members were dispersed, and the Monday Club met its natural death.'**[১৫]

সুনীতিকুমার মানডে ক্লাবের 'স্বাভাবিক মৃত্যু'র কথা বললেও, মানডে ক্লাবের অবলুপ্তির মূলে সুকুমারের একটি পারিবারিক শোকাবহ ঘটনারও ভূমিকা থাকা সম্ভব। ১৯১৯ সালের ৭ এপ্রিল সুকুমারের সবচেয়ে ছোট বোন শান্তিলতার মৃত্যু ঘটে। শান্তিলতাব বিবাহ হয়েছিল প্রভাত চৌধুরীব সঙ্গে (এঁর কথা উল্লেখ আছে সুকুমারেব বিলেত থেকে লেখা চিঠিতে[১৬]) সুকুমারের বিবাহের ঠিক দু'সপ্তাহ পরে [২৬ ডিসেম্বর, ১৯১৪]।

লেখা আঁকায় দক্ষতা ছিল শান্তিলতারও। পুণ্যলতা ছাড়া একমাত্র লীলা মজুমদারই তাঁব সম্বন্ধে সামান্য কিছু কথা লিখে গেছেন : 'জ্যাঠামশায়েব [উপেন্দ্রকিশোর] স্বল্পায়ু মেয়ে শান্তিলতার তখনো বিয়ে হয়নি। আমবা তাকে ডাকতাম টুনিদি বলে। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি মিঠে স্বভাব। তার লেখা দু-একটা কবিতা সন্দেশে বেরিয়েও ছিল। তার একটি হল, "ওগো বাঁধুনী শোন গো শোন।"·

'এই টুনিদিকে আর দেখি নি। মাত্র ২৪ বছর বয়সে নিউমোনিয়া হযে. শেষ একটা "দাদা! বলে ডাক দিযে মারা গেছিল।"[১৭]

১ : সুবিমল রায়, 'উপেন্দ্রকিশোর রায়ের কথা', "সন্দেশ", বৈশাখ, ১৩৭০, পৃ. ৩১-৩২। ২ : সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'উপেন্দ্রকিশোর : শিল্পী ও কারিগর', "এক্ষণ" শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯১, পৃ. ৮৯। ৩ : সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'সুকুমার রায় : জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি', "এক্ষণ" বার্ষিক সংখ্যা ১৩৯৩, পৃ. ২৫৬। 'চান্দা' সম্বন্ধে মাঘ, ১৩২১ সংখ্যার 'সন্দেশ'-এ লেখকের নামহীন একটি রচনায় লেখা হয়েছে : 'চান্দা' কলিকাতা থেকে প্রায় ৮০০ মাইল দূরে। হাওড়া নাগপুর বোম্বাই যাবার ট্রেনে আগের দিন বিকেলে রওয়ানা হয়ে পরদিন বিকেলে সেই ট্রেন থেকে চান্দা যাবার ট্রেনে উঠতে হয়, তারপর চান্দা পেঁছিতে প্রায় রাত দশটা বাজে।' লেখাটির সঙ্গে ছিল উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা ছবি। উপেন্দ্রকিশোর ও পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে সুকুমারও হয়ত সেই বিবাহ উপলক্ষ্যে চান্দা শহরে গিয়েছিলেন। ৪ : [কালিদাস নাগের ডায়েরী] 'বিশ্ব পথিক কালিদাস নাগ', ১৩৯৩, পৃ. ২২৯। ৫ : হিরণ কুমার সান্যাল, 'পরিচয়ের কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র', ১৯৭৮, পৃ. ১৫৯-১৬০। ৬ : প্রভাত কুমার গঙ্গোপাধ্যায় 'আমাদের মানডে ক্লাব', "যুগান্তর", ১৪ জুলাই, ১৯৬৩। ৭ : মানসী মুখোপাধ্যায়, 'অতুল প্রসাদ', ১৯৭১, পৃ. ৮২।

৮ঃ হেমেন্দ্র কুমার রায়, 'যাঁদের দেখেছি', ২য় পর্ব, ১৩৫৯, পৃ. ২১৩। ৯ঃ সুকুমার সাহিত্য সমগ্র', ৩য় খণ্ড, সম্পা. সত্যজিৎ রায়, ১৯৮৯, পৃ. ৪২১-৪২২। ১০ঃ তদেব, দ্রঃ পৃ. ২৬৯, ২৭১। ১১ঃ তদেব, মুদ্রিত বার্ষিক বিবরণীগুলি অনুসারে। ১২ঃ 'আমাদের মানডে ক্লাব'। ১৩ঃ 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র', ৩য় খণ্ড, মুদ্রিত বার্ষিক বিবরণীগুলি অনুসারে। ১৪ঃ হিরণ স্যান্যাল..., পৃ ১৬৬। ১৫ঃ Suniti Kumar Chaterji, 'Priya-Darsa Amal Chandra' "The Calcutta Municipal Gazette", Tagore Memorial Special Supplement, Reprint ঃ 1986, p. iv. ১৬ঃ 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র' ৩য় খণ্ড, পত্রসংখ্যা ঃ ৪। ১৭ঃ লীলা মজুমদার, পাকদণ্ডী', ১৯৮৬, পৃ. ১৮-১৯।

২

জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ক্লাব মোটামুটি মানডে ক্লাবের সমসাময়িক। 'বিচিত্রা'র অধিকাংশ অধিবেশন হত বুধবার জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' বাড়ি বা লালবাড়িতে। এই বিচিত্রা চলেছিল ১৯১৮ সাল অবধি। বাংলা সাহিত্যে এই আসরের অবদানও আছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্প, অজিত চক্রবর্তীর প্রবন্ধমালা ইত্যাদি 'বিচিত্রা'র আসরের জন্য লেখা হয়েছিল।

মানডে ক্লাবের অনেক সদস্য যেমন অজিত চক্রবর্তী, সত্যেন দত্ত, কালিদাস নাগ, সুকুমার—এঁরা এই আসরেও যেতেন। এই নিয়ে মজার বিপত্তির কথা শুনিয়েছেন মানডে ক্লাবের কনিষ্ঠ সদস্য হিরণকুমার সান্যাল ঃ 'বিচিত্রা'র সেই অধিবেশনটি হয়েছিল আবার সোমবার। সেদিন খোদনবাবুর [শিশিরকুমার দত্ত—মানডে ক্লাবের সেক্রেটারি] সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে ছিল মানডে ক্লাবের সভা। অজিতবাবুর [অজিতকুমার চক্রবর্তী] সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম 'বিচিত্রা'য়। প্রবন্ধটি পাঠ করেই রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে আর কোন প্রশ্নের অবকাশ না-দিয়ে আমরা জোর পায়ে হেঁটে চলে এলাম মানডে ক্লাবে। এসে আমরা ঢুকতেই হৈ-হৈ কাণ্ড। সকলেই, বিশেষ করে তাতাদা [সুকুমার] আর দ্বিজেন কাকা [ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র] বললেন, 'কোথায় তোমরা গিয়েছিলে ? আমাদেরও তো যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই মানডে ক্লাব আগে, না, বিচিত্রা আগে। দেখ, তোমরা ঐ জমিদার বাড়িতে গিয়ে যা দেখেছো খেয়েছো—আমরা এই পাশের দোকানের গরম গরম কচুরি আর আলুর দম খেয়েছি তার থেকে কি বিশেষ ভালো হবে ?' শেষে কালিদাস নাগ বললেন, শাস্তি দিয়ে কাজ নেই—একটা ভোট অব সেনসর দিয়ে ওদের ছেড়ে দেওয়া হোক।'[১]

এই 'বিচিত্রা'র আসরে সুকুমার 'বৈকুন্ঠের খাতা' নাটকে কেদারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ঃ 'বৈকুন্ঠের খাতা' অভিনয় সত্যই আশ্চর্য সুন্দর হইয়াছিল। সাজসজ্জাও যা হইয়াছিল—চমৎকার ! কেদারের ভূমিকায় সুকুমার

বাবুর বিকট মুখভঙ্গী এখনও যেন চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই। বৈকুণ্ঠ সাজিয়াছিলেন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ সাজিয়াছিলেন 'তিনকড়ি'। অভিনেতারা বইয়ে যা নাই এমন দু-চার কথা বলিয়া পরস্পরকে ঠকাইবার চেষ্টাও দুই-চারিবার করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠকিবার পাত্র কেহই ছিলেন না, সকলেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন।'[২] এই অভিনয় সম্ভবত হয়েছিল ১৯১৭-র ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে।[৩]

এই 'বিচিত্রা'র আসরে সুকুমার একবার ভাই সুবিনয় ও অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে রামায়ণ অবলম্বনে লেখা কথকতাসহ কৌতুক নক্শা করে শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছিলেন প্রচুর। হেমেন্দ্রকুমার রায় স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে এ সম্পর্কে লিখছেন: '·· আবৃত্তির সঙ্গে হাস্যরসাভিনয়ে ভ্রাতৃযুগলের অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পেলুম সেই প্রথম। তাঁরা আসর একেবারে জমিয়ে তুললেন। অভিনয়ের গুণে পালাটির কোন কোন লাইন আজও আমার মনে আছে! যেমন

'শোন রে ব্যাটা হনুমান
করি আমি অনুমান
অষ্ট আনা জরিমানা আজি তোর হইল।'[৪]

এই নাটকটির নাম ছিল সম্ভবত 'অদ্ভুত রামায়ণ'। এর প্রকৃত চেহারা কি রকম ছিল তা জানা না গেলেও, ননসেন্স ক্লাবের যুগে লেখা 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এর সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল ছিল এমন অনুমান করা যেতে পারে। শান্তিনিকেতনেও সদলে এই নাটকের গীতসহযোগে অভিনয়ও হয়েছে।[৫]

অভিনয়, রচনা-পাঠ, কথকতা ইত্যাদি ছাড়াও সুকুমার 'বিচিত্রা'র বিভিন্ন আলোচনায় অংশ নিতেন। 'বিচিত্রা' যুগের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে এই ক্লাবের একসময়ের সভ্য সুকুমার বসু কিছুটা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন —সেইসঙ্গে সুকুমারের ব্যক্তিত্ব তাঁর কাছে যেমন মনে হয়েছিল তাও তুলে ধরেছেন: '…আর আসতেন সুকুমার রায় (চৌধুরী)। তখনকার দিনে যে যুবক দল সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় প্রয়াসী ছিলেন, তিনি তাঁদের নেতা ছিলেন বলা যায়: কোনো কোনো মানুষ দেখা যায় আত্মীয়বন্ধু-মহলে যাঁর আবির্ভাবমাত্র ছেলেবুড়ো সকলের মধ্যে একটা খুশির প্রবাহ বয়ে যায়, সুকুমার ছিলেন তেমনি ধরনের মানুষ।…উজ্জ্বল মুখশ্রী, ভাবভঙ্গী অতিশয় আকর্ষণীয়। ছোটদের ও বন্ধুমহলে, সর্বত্র তিনি স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি আলোচনায় অনেক সময় যোগ দিতেন।…'

'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যেদিন তাঁর ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধ পড়েছিলেন সেদিন আমি বিচিত্রায় ছিলাম না। কিন্তু ছন্দ সম্বন্ধে প্রচুর সুন্দর উদাহরণ সমেত রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোজ্ঞ প্রবন্ধটি যেদিন পড়েন সেদিন উপস্থিত ছিলাম।

সেদিনকার আলোচনার উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ এই যে, প্রবন্ধপাঠের পর সুকুমার রায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন "গদ্যে কি ছন্দ আছে ?" একথা শুনে সকলেই মৃদু হেসেছিলেন। কবি একটু চুপ করে থেকে বললেন, "সাধারণ গদ্যের কথা যদি ছেড়ে দাও তো, যাকে বলে impassioned prose তার মধ্যে একটা ছন্দ পাওয়া যায়।"[৬]

১ঃ হিরণ সান্যাল..., পৃ. ১৬১। ২ঃ 'পুণ্যস্মৃতি', পৃ. ১২৪। ৩ঃ তদেব, দ্র. ১২৩, ১২৪। ৪ঃ হেমেন্দ্রকুমার রায়, 'যাঁদের দেখেছি' (দ্বিতীয় পর্ব), ১৩৫৯, পৃ. ১১৪-১৮। ৫ঃ পুণ্যস্মৃতি, পৃ. ২৪০। ৬ঃ সুকুমার বসু, 'বিচিত্রাপর্ব' (স্মৃতিকথা), "বিশ্বভারতী পত্রিকা" বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯, পৃ. ৪৩৭-৪৪৬।

৩

রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সদস্য করার মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মধর্মান্দোলনে প্রাণশক্তি ও নতুন গতিবেগ সঞ্চারের কথা ভেবেছিলেন সুকুমার ও তাঁর সঙ্গী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাঁরা দেখেছিলেন তাঁদের কাঙ্ক্ষিত আদর্শ পুরুষকে যিনি ধর্মান্দোলনের মন্দীভূত ধারায় নতুন করে জোয়ার আনতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের মধ্যে, সাহিত্য-সাধনার মধ্যে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘকালের বহুমুখী সাধনার ধারা সংহত হয়ে প্রত্যক্ষরূপ নিয়েছে—এই বক্তব্য বিলেতে লেখা The spirit of Rabindranath প্রবন্ধেও ফুটে উঠেছিল।

সম্মানিত সদস্য করার রীতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ছিলই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দু'বছর পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে এবং রবীন্দ্রনাথের নাম এ ব্যাপারে প্রস্তাবিত হওয়ার কিছুকাল আগে বিখ্যাত ওরিয়েণ্টালিস্ট ও প্রার্থনা সমাজের নেতা আর. জি. ভাণ্ডারকরকে সম্মানিত সভ্য করা হয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণগোষ্ঠীর কিন্তু অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে পছন্দ করতেন না। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের গান ও 'গোরা'র মতো উপন্যাস লিখেছেন, নিজেকে হিন্দু বলেন, কন্যাদের বিবাহ দিয়েছেন কম বয়সে—এ ধরনের অভিযোগ প্রকাশ্যে বা পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিপত্রে পাওয়া যেত। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের বার্ষিক সভায় সম্মানসূচক অভিনন্দন প্রস্তাব গ্রহণ করলেও, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক প্রবীণ ব্রাহ্মেরই অসহিষ্ণু ও তির্যক মনোভাব থেকে গিয়েছিল।

ফলে ১৯১৬-তে সুকুমার এবং প্রশান্তচন্দ্র যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিক সদস্য করার প্রস্তাব আনলেন স্বাভাবিকভাবে তা নাকচ হয়ে গেল। একই ঘটনা বারবার ঘটল পরপর কয়েক

বছর। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সুশোভন সরকার লিখছেন : 'বৈঠকের পর বৈঠকে রবীন্দ্রনাথকে নির্বাচনের প্রস্তাব উঠতে থাকল এবং এটা নির্ধারিত ছিল যে প্রস্তাব উত্থাপন করবেন সুকুমার রায় আর তা সমর্থন করবেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। বৈঠকের পর বৈঠকে সভাপতি [কৃষ্ণকুমার মিত্র] কোনো-না-কোনো ফিকির তুলে প্রস্তাবটি নাকচ করে দিতেন। প্রস্তাব কিছুতেই ভোটে আনা সম্ভব হতো না।

এই উত্তেজনা যখন তুঙ্গে উঠেছে, তখনই যুবকদের মধ্যে একটা প্রস্তাব আসে যে প্রধান নেতাদের স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদে আসন্ন ২১-এর ১১ মাঘ-এব [১৯২১ খ্রি.] উৎসব বর্জন করা দরকার এবং সেই সময় একটি পৃথক উৎসবেব ব্যবস্থা করা সমীচীন। অবস্থাটা খুবই সঙ্গিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এর আগেও ভাঙন ধরেছিল অনেকখানি নবীনদের জন্যই।'

'আমাদের আলাদা উৎসব শুরু হল। কযেকদিন চলেও ছিল···[প্রভাত-কসুম রায়চৌধুরীব বাড়িব ছাদে]'· '···কিন্তু এই আলাদা উৎসব ১১ মাঘ পর্যন্ত টানবার দরকার হলো না। কারণ ইতিমধ্যে একটা নিষ্পত্তির নির্দেশ পাওয়া গেল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটা স্প্লিট্‌ হওয়ার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই কয়েকজন ব্রাহ্ম আইনজ্ঞ সালিশী হিসেবে এগিয়ে এলেন,— বললেন, 'একটা কাজ করা যাক।' আইনজীবীদের প্রস্তাব ছিল, কলকাতা শহর ও মফঃস্বলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যত সভ্য আছে সবাইকে নিয়ে একটা 'বেফারেনডাম' বা গণভোট গ্রহণ করা হোক। সেই গণভোট ১৯২১-এর মার্চ মাসে [১৯ মার্চ, ১৯২১] অনুষ্ঠিত হয়েছিল, আর তাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব নির্বাচিত হয়েছিলেন—তাঁর পক্ষে পড়েছিল ৪৯৬ ভোট, বিপক্ষে ২৩২ ভোট।'[১]

প্রবীণদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র, ব্রজেন শীল, ডাঃ নীলরতন সরকার প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিরা ছিলেন সুকুমারের নেতৃত্বাধীন যুবগোষ্ঠীর পক্ষে। কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, রজনীকান্ত বসু, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রমুখ খ্যাতনামা ব্রাহ্মরা ছিলেন যুবগোষ্ঠীর বিপক্ষে। নির্বা-চনের সামান্য কিছুকাল আগে এঁদের অনেকেই পরিকল্পিতভাবে পদত্যাগ করে উত্তেজনার পরিবেশও সৃষ্টি করে ছিলেন।[২] এ ধরণের সম্ভাবনার কথা আন্দাজ করেই সুকুমার ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ গণভোটের ঠিক চারদিন আগে নির্বাচক-মণ্ডলী তথা ব্রাহ্মসাধারণের জন্য প্রকাশ করলেন ৫২ পাতার একটি পুস্তিকা 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই'। [রচয়িতা হিসেবে প্রশান্ত মহলানবীশের নাম থাকলেও, এক্ষেত্রে সুকুমারের-ও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে—রচনাভঙ্গী, যুক্তিবিন্যাস ও লেখার বাঁধুনি থেকে এমন অনুমান করা চলে।] রবীন্দ্রনাথের মহত্বপূর্ণ ও প্রেরণাময় দিকগুলি তুলে ধরার আগে যুবগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে

প্রশান্তচন্দ্র এই পুস্তিকায় জানালেন, তাঁরা বিরোধীদের কাছ থেকে যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠা আশা করেন : 'আলোচনা ক্ষেত্রে তাঁহারা facts এর সম্মুখে facts, প্রমাণের সম্মুখে প্রমাণ, যুক্তির সম্মুখে যুক্তি উপস্থিত করিলে সত্য অবশ্যই জয়যুক্ত হইবে। Facts এর বদলে তাঁহাদের উক্তি, প্রমাণের বদলে তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও যুক্তির বদলে তাঁহাদের নাম উপস্থিত করিয়া কোনো লাভ নাই।'

শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে তিন তিনবার স্থগিত থাকার পর [জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে] বার্ষিক অধিবেশন বসে ১৯ মার্চ, ১৯২১ তারিখে। ওই সভায় ব্যালট ভোটে রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত সদস্য হলেন এবং শেষ পর্যন্ত সুকুমারের নেতৃত্বে যুবগোষ্ঠীর জয় হল।

এইসব ঘটনার সাক্ষী ছিলেন হিরণকুমার সান্যাল-ও। তাঁর মতে, 'প্রশান্তচন্দ্র এই আন্দোলনের ছিলেন স্টার্টেজিস্ট কিন্তু সুকুমার রায় ছিল এর প্রাণকেন্দ্র।'[৩] আরো বিস্ময়ের কথা যা তিনি শুনিয়েছেন তা হল, এই তীব্র বিরোধিতা ও মতভেদের মধ্যে সুকুমারের সঙ্গে প্রবীণ গোষ্ঠীর সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। সুকুমার সম্বন্ধে তাঁরা উচ্চ ধারনাই পোষণ করতেন : 'কিন্তু এই তীব্র বিরোধের মধ্যেও প্রবীণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। সমাজমন্দিরে হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে তাতাদের আলোচনার কথা। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বলো তো সুকুমার জীবনের আদর্শ কি ? সুকুমার উত্তর দিয়েছিলেন সিরিয়াস ইন্টারেস্ট ইন লাইফ। উত্তরটা শুনে হেরম্বচন্দ্র এতই খুশি হলেন যে তখনই সন্দেশ আনিয়ে সকলকে খাওয়ালেন।'

'...ব্রাহ্মসমাজের যাঁরা প্রবীণ, যাঁদের সঙ্গে তীব্র বিরোধ ছিল ওঁদের— যখনই তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন তাতাদা [সুকুমার], তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে শুনেছেন। সুকুমারের প্রতি তাঁদের যে গভীর স্নেহ তা তাঁদের কথায় বারবার প্রকাশ পেত। সেটা শুধু উপেন্দ্রকিশোরের ছেলে ব'লে নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বই ছিল এমন যা সকলকে আকর্ষণ করত। এই সুকুমারও যে তাঁদের বিরোধিতা করবে এই ছিল তাঁদের দুঃখ।'[৪]

১ : সুশোভন সরকার, 'যা মনে পড়ে', "বারোমাস", শারদীয় ১৯৮২, পৃ. ৩। ২ : দিলীপ কুমার বিশ্বাস, 'সুকুমার রায় ও ব্রাহ্মসমাজ', "দেশ" ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬, পৃ. ১০৩। ৩ : হিরণকুমার সান্যাল..., পৃ. ১৬৬। ৪। তদেব।

৪

তরুণ-ব্রাহ্মরা কয়েকটি ক্লাব-জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন। এগুলিকে বলা হত 'ফ্রেটারনিটি'। ১৯১৮ সালের শেষের দিক নাগাদ সুকুমার রায়ের উদ্যোগে 'ছাত্রসমাজে'-এ নতুন প্রাণশক্তি ও কর্মোদ্যোগ দেখা যায়, তারই অঙ্গ

হিসেবে জন্ম হয়েছিল 'ফ্রেটারনিটি'র। সুকুমার ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের নেতৃত্বে তরুণ ব্রাহ্মরা 'ছাত্র সমাজে' পরিবর্তনের প্রাথমিক কাজ হিসেবে এই সমাজের সভ্য হওয়ার আবেদন-পত্রে পরিবর্তন আনেন। এর জন্যে গঠিত হয় রুল্‌স্‌ রিভিশন কমিটি'। নূতন গঠনতন্ত্রও স্থাপিত হয় পরের বছর। এই সব কর্মোদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে জন্ম হয় ফ্রেটারনিটির সম্ভবতঃ ১৯১৯ খ্রি.-এর ৬ ডিসেম্বর।[১]

তরুণ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের সান্নিধ্যে আসা অব্রাহ্ম-তরুণদের সংগঠিত করার সঙ্গে তাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটানোও এর লক্ষ্য ছিল।

ফ্রেটারনিটির এক সময়ের সক্রিয় সদস্য সুশোভন সরকার লিখছেনঃ 'আমরা চারটি ফ্রেটারনিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। ডিভোশানাল, এডুকেশানাল, লিটেরেরি ও সোশাল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উত্তর দিকে যে গলি আছে সেইখানে একটা ব্রাহ্ম পাড়া গড়ে উঠেছিল। প্রথম তিনটি ফ্রেটারনিটির বৈঠক বসতো সেই গলির মধ্যে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বাড়িতে।'[২]

এডুকেশানাল ফ্রেটারনিটির মধ্যে চারটি পাঠচক্রের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এগুলি হল রবীন্দ্রনাথ, এমার্সন, তুলনামূলক সাহিত্য ও সমাজবিদ্যা বিষয়ক।[৩]

এডুকেশানাল ফ্রেটারনিটির অন্তর্গত পাঠচক্রগুলিতে নানাধরনের প্রসঙ্গ আলোচিত হতঃ 'এইসব পাঠচক্রের বিষয়-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলেও বোঝা যাবে সংগঠকদের দৃষ্টিভঙ্গীর নবীনতা। প্রথম বছরেই, আলোচনার বিষয় ছিলঃ বিবাহের আদর্শ ও বিবর্তন—ওয়েস্টার মার্ক ও কার্ল পিয়ার্সনের মতবাদ, ধর্মে প্রার্থনা ও সম্প্রদায়ের স্থান, ঈশ্বরের বোধ কি ব্যক্তিগত, বেদান্ত অজ্ঞেয়বাদ প্রামাণ্যবাদ, বলশেভিজম ও লেনিন, লেনিন ও গান্ধী, অপরাধ জগৎ, কংগ্রেস ও অসহযোগ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাসেল ও গান্ধী, ফ্রয়েড ব্যাডবি ইউয়েন, আইনস্টাইন ও আপেক্ষিকতাবাদ, সমাজবাদ এবং বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে সাম্প্রতিকতম লেখক ও বিশ্বসাহিত্যে গ্রীক নাটক থেকে ইবসেন ব্রাউনিং টেনিসন পর্যন্ত।'[৪]

আলোচনায় যোগ দিয়েছেন অনেক মনীষী, যেমনঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ক্ষিতিমোহন সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, গিরীন্দ্রশেখর বসু, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

সোশাল ফ্রেটারনিটির জন্ম হয় আরো পরে—ভিন্ন তাগিদে এর সৃষ্টিঃ 'সমাজ পাড়ায় একটা ঘরোয়া ক্লাবের অভাব আমরা খুবই অনুভব করতাম, সেই তাগিদেই সোশাল ফ্রেটারনিটির সৃষ্টি।' ...'যতদূর মনে পড়ে প্রথম অধিবেশন হয় ৮ এপ্রিল ১৯২১। ১৯২১—১৯২২ সালে সোসাল ফ্রেটারনিটির জমজমাট অবস্থা।' ...'অসংখ্য যুবক-যুবতী সাগ্রহে ক্লাবের সদস্য হন। সীতাদি

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা—লেখিকা] সম্পাদিকা নির্বাচিত হলেন; তাঁর যোগ্যতার জন্যই প্রতিষ্ঠান দানা বাঁধল, সফল হয়ে উঠল।'[৫]

সোশাল ফ্রেটারনিটির প্রসঙ্গ সীতাদেবীর লেখাতেও আছে। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় ১৯২৩-এ আলিপুর আবহাওয়া অফিস সংলগ্ন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের কোয়ার্টারের বাগানে সোশাল ফ্রেটারনিটির বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব হয়েছিল। প্রতিমাদেবী ও নন্দিনীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এসেছিলেন ভারতবিদ্যাবিদ ও সংস্কৃতজ্ঞ প্রফেসর উইনটারনিৎস।[৬]

রবীন্দ্রনাথ মোট তিনবার এসেছিলেন সোশাল ফ্রেটারনিটির সভায়। এর মধ্যে একদিন শুনিয়েছিলেন তাঁর সদ্য রচিত নাটক 'মুক্তধারা।'[৭]

ফ্রেটারনিটি ইত্যাদি পরিকল্পনার ব্যাপারে সুকুমার রায়ের বড় ভূমিকা থাকলেও তিনি অন্তরালে থাকতেন। এই বিস্ময়কর তথ্যটি জানিয়েছেন সুশোভন সরকার: 'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি তাতাদা ফ্রেটারনিটি [সোশাল ফ্রেটারনিটি] বৈঠকে কখনই উপস্থিত থাকতেন না, যদিও সমস্ত পরিকল্পনাটা তাঁর। হয়ত ইতিমধ্যেই তাঁর শরীর অসুস্থ হতে আরম্ভ করেছে; কিংবা তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণদের বিরুদ্ধে অভিযানে।'[৮]

এই ফ্রেটারনিটির সমাপ্তির অন্যতম কারণও সুকুমার রায়ের মৃত্যু: 'দিন বদল হয় অনিবার্যভাবে। ১৯২২—১৯২৩ সালে আমাদের সাধের সোশাল ফ্রেটারনিটি স্তিমিত হয়ে গেল। সুকুমারের দীর্ঘ অসুস্থতা ও অবশেষে মৃত্যু তরুণ ব্রাহ্মদের প্রগতি অভিযানকে সেদিন স্তব্ধ করে দেয়।'[৯]

১: সুশোভন সরকার, 'সোশাল ফ্রেটারনিটি ও সীতাদেবী', "দেশ" ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২। ২: সুশোভন সরকার, 'সুকুমার রায় / যা মনে পড়ে', "বারোমাস", শারদীয় ১৯৮২, পৃ. ২। ৩: স্বপন মজুমদার, 'সুকুমার রায় ও তরুণ ব্রাহ্মসমাজ', "শতায়ু সুকুমার", পৃ. ৭০। ৪: তদেব, পৃ. ৭০-৭১। ৫: .. 'সোশাল ফ্রেটারনিটি ও সীতাদেবী', পৃ. ৩৪১। ৬: সীতাদেবী, 'পুণ্যস্মৃতি', পৃ. ২৪০। ৭: ...'সোশাল ফ্রেটারনিটি ও সীতাদেবী', পৃ. ৩৪২। ৮। 'সুকুমার রায় / যা মনে পড়ে', পৃ. ২। ৯: 'সোশাল ফ্রেটারনিটি ও সীতাদেবী', পৃ. ৩৪২।

পঞ্চম অধ্যায়

১৯২১—১৯২৩

প্রসঙ্গ ঃ

১ ঃ 'সন্দেশ' ও সুকুমার

২ ঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা একটি 'Confidential' চিঠি

৩ ঃ 'অতীতের ছবি'

৪ ঃ 'ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর'

১

উপেন্দ্রকিশোরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি নিঃসন্দেহে 'সন্দেশ।' আর 'সন্দেশ' পত্রিকা ছাড়া 'আবোল তাবোল' 'হ য ব র ল'-র লেখককে আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ।

সন্দেশের জন্মক্ষণের ছবি ধরা আছে লীলা মজুমদারের স্মৃতিকথায়ঃ "১লা বৈশাখ ১৩২০। সেদিনটা আমার এখনো মনে আছে। সন্ধ্যেবেলা আমরা সকলে দোতলার বসবার ঘরে বসে আছি।...এমন সময় জ্যাঠামশাই [উপেন্দ্রকিশোর] হাসতে হাসতে ওপরে উঠে এলেন। হাতে তাঁর 'সন্দেশে'র প্রথম সংখ্যা। কি চমৎকার তার মলাট! গাল-ভরা সন্দেশ, হাতে 'সন্দেশ' ভাই-বোন শোভা পাচ্ছে। যতদূর মনে হয় এইটেই ছিল প্রথম মলাট। মা [সুরমা], বড়দিদি [সুখলতা], টুনিদিদি [শান্তিলতা] সবাই মিলে যে-রকম আনন্দ কোলাহল করে উঠলেন, তাতে আমাদের বুঝতে বাকি রইল না যে আজ একটা বিশেষ দিন।"[১]

সে সময়ে 'সন্দেশ' ছিল ৩২ পাতার, ছাপার জগতের ভাষায় ৪ ফর্মা। উপেন্দ্রকিশোর বা পরবর্তীকালে সুকুমার কৃত রঙীন প্রচ্ছদের পর থাকত পাতা-জোড়া ছবি—বেশির ভাগই রঙীন। সূচনা-পত্রে থাকত একটি কবিতা। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ছিল 'শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, বি.এ.' রচিত কবিতাঃ 'নূতন বরষে ভাই আমাদের ঘরে, / 'সন্দেশ' এসেছে আজ নব সাজ প'রে।' অধিকাংশ লেখাই পাইকা হরফে ছাপা, প্রুফ-ভুল প্রায় নেই। লেখকদের নাম থাকত লেখার শেষে।

চৈত্র, ১৩২২ সংখ্যায় মুদ্রিত 'সন্দেশের হিসাব' লেখাটিতে প্রদত্ত তথ্য নির্ভরযোগ্য হলে বলা যেতে পারে, সন্দেশের প্রতিসংখ্যা তিনহাজার কপি ছাপা হত।

উপেন্দ্রকিশোর 'সন্দেশ' সম্পাদক ছিলেন বৈশাখ, ১৩২০ থেকে পৌষ, ১৩২২ পর্যন্ত। সুকুমার ১৩২২, মাঘ সংখ্যা থেকে ১৩৩০, ভাদ্র পর্যন্ত। উপেন্দ্র-কিশোরের যুগে নামহীন রচনার সংখ্যা সুকুমারের সম্পাদনার যুগে অনেক কমে এসেছে। সাধারণভাবে প্রথমদিকে রায় পরিবারের যাঁরা সন্দেশে লিখতেন পত্রিকায় তাঁদের নাম থাকত না; সুকুমারের সময়ে অবশ্য ধীরে ধীরে অধিকাংশ লেখকের নাম ছাপা শুরু হয়েছে—তবে সুনির্দিষ্ট কোনো নীতি ছিল না। সুকুমার অবশ্য নিজের সব লেখাই নাম ছাড়াই ছাপিয়েছেন, শুধু তাঁর ছবিতে থাকত S. R. স্বাক্ষর। এমনকি তিনি যে 'সন্দেশ' সম্পাদক তা প্রথম পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ সংখ্যায়ঃ 'গত দুইবৎসর ধরিয়া 'সন্দেশের'

সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় গুরুতর রোগে শয্যাগত থাকায়, সন্দেশের কাজ সাক্ষাৎভাবে দেখা অনেক সময়ই তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না।'

পত্রিকায় সাধারণভাবে শুধু লেখা থাকত 'স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত।'

উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, কুলদারঞ্জন, প্রমদারঞ্জন এঁদের কথা বাদ দিলে বহু বিখ্যাত লেখকের পরবর্তীকালে সুপরিচিত লেখার প্রথম মুদ্রণ সন্দেশেই। যেমন ঃ অবনীন্দ্রনাথের 'খাতাঞ্চির খাতা' [বৈশাখ ১৩২৭ থেকে মাঘ ১৩২৭ সংখ্যা পর্যন্ত] সত্যেন দত্তের 'ইল্‌শে গুঁড়ি', 'পাল্কীর গান' ইত্যাদি কবিতা। [রবীন্দ্রনাথের 'সে'-র কিছু অংশ বেরিয়েছিল সন্দেশে সুকুমারের মৃত্যুর বেশ কিছুকাল পর। লেখাটিতে 'সুকুমার' চরিত্রটি লক্ষ করবার মতো।] সীতা দেবীর 'নিরেটগুরুর কাহিনী' [ভাদ্র, ১৩২৩ থেকে ধারাবাহিক, লেখিকার নাম ছিল না।] প্রিয়ম্বদা দেবীর 'পঞ্চুলাল' [Pinnacio অনুবাদ, ধারাবাহিক বৈশাখ, ১৩২৬ থেকে] অতুলপ্রসাদের 'বাতাসের গান' [প্রথম লাইন ঃ মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে' ঃ পৌষ, ১৩২৫] রবীন্দ্রনাথের 'বৃষ্টি ও রৌদ্র' [ভাদ্র, ১৩২৮] 'সময় হারা', [বৈশাখ ১৩৩০] ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছিল সন্দেশে। এমন সব রঙীন হাফটোন ফটোগ্রাফ বা মাইক্রো-ফটোগ্রাফিক ক্যামেরায় তোলা ছবি সন্দেশে ছাপা হত—যা গুণে মানে আজো বিস্ময় জাগায়। সদ্য ছাগল গলাধঃকরণ করেছে এমন অজগরের ছবি, বহুগুণ বর্দ্ধিত মাছির ছবি, কীটপতঙ্গের যেমন প্রজাপতির বহুবর্ণোজ্জ্বল ছবি (সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—'মেজদাদামশাই'-এর প্রবন্ধ) ইলেকট্রনিক ও কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত এই ছবি ছাপার যুগেও পাঠককে বিস্মিত করবে।

উপেন্দ্রকিশোর কৃত রচনা-সজ্জা, লে-আউট ইত্যাদি মোটামুটি একইরকম রেখেছিলেন সুকুমার নিজের আমলে। পিতার মৃত্যুর পর যতদিন গেছে সুকুমারের লেখা ও আঁকার পরিমাণ তত বেড়েছে। উচ্চমানের লেখার চাহিদা মেটাতে একই সংখ্যায় বেরিয়েছে সুকুমারের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ধাঁধাঁ, ইলাস্‌-ট্রেশন, তিনরঙা ছবি—ইত্যাদি। অবশ্য উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনার যুগেই সুকুমার তাঁর মজার লেখা ও ছবির গুণে পাঠকদের আকৃষ্ট করেছিলেন। কবি সুনির্মল বসুও কিশোর বয়সে ওই সব মজার লেখার ও ছবির রচয়িতা কে তা জানার কৌতূহল সামলাতে না পেরে উপেন্দ্রকিশোরের কাছে গিয়েছিলেন [উপেন্দ্রকিশোর তখন অসুস্থ, স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এসে উঠেছেন গিরিডিতে গগন হোমের 'হোমভিলা' বাড়িতে[২]] ঃ 'একদিন দেখলাম উপেন্দ্রবাবু বিকেলে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরছেন। ...সমস্ত স্নায়বিক দৌর্বল্য ঝেড়ে—আমরা তাঁকে নমস্কার করলাম, আর সোজা প্রশ্ন করে বসলাম—"সন্দেশের ঐসব মজার মজার গল্প-কবিতা কার লেখা ?"

উপেন্দ্রবাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে তাঁর কালো কুচ্‌কুচে দাড়ী নেড়ে বললেন, "তা বলব কেন বাপু।"

ব্যাস্‌ আমরা প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম,—আর কি সেখানে দাঁড়াই ?

একদিন আমাদের বন্ধু মুলু (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ছোট ছেলে প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—অল্প বয়সে সাইকেল থেকে পড়ে আহত হয়ে মারা যায়) আমাদের সমস্ত রহস্যের উদ্ঘাটন করল। সে বললে "এসব লেখা তাতাদার। তাতাদা হচ্ছেন উপেন্দ্রবাবুর বড় ছেলে সুকুমার রায়।"[৩]

শিশু বালকদের ভোকাবুলারির সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন থেকে লেখার ক্ষমতা উপেন্দ্রকিশোরের ছিল—'টুনটুনির বই' 'ছোটদের রামায়ণ' ইত্যাদি-এর প্রমাণ। অন্যদিকে সুকুমারের হাত খুলত আর একটু বয়স্কদের লেখায়। সত জিৎ রায় এ প্রসঙ্গে বলছেন : 'বাবার সন্দেশের চেহারাটা ঠাকুর্দার সন্দেশের থেকে অনেক আলাদা হয়ে গেল। শিশুদের পত্রিকা থেকে হঠাৎ কিশোরদের পত্রিকা হয়ে উঠল।'[৪]

১ : 'পাকদণ্ডী', পৃ. ২১-২২। ২ : সুনির্মল বসু, 'জীবন খাতার কয়েক পাতা', "সুনির্মল রচনা-সম্ভার", তৃতীয় খণ্ড, ১৩৮২, পৃ. ২২০। ৩ : তদেব, পৃ. ২২০—২২১ ৪ : নন্দন প্রেক্ষাগৃহ, ১৬মে ১৯৮৬, সন্দেশের রজত জয়ন্তী উৎসবের ভাষণ। সূত্র : প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, 'সন্দেশ-সম্পাদক' সুকুমার রায়, "দেশ" ৬.৯.১৯৮৬ সংখ্যা, পৃ. ৭৬

২

রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সম্মানিত সদস্য করার আন্দোলন তর্কবিতর্ক উত্তেজনা যে সুকুমার রায়কে ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত করে দিয়েছিল তা বোঝা যায় ১৯২০ সালের ২৩ আগস্ট প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে লেখা একটি 'Confidential' নামাঙ্কিত চিঠি থেকে। সেই সঙ্গে তৎকালীন ব্রাহ্ম-ধর্মান্দোলন, ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে সাময়িকভাবে হলেও বিশ্বাস হারিয়েছিলেন, সেকথাও তিনি চিঠিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হল এ চিঠিতে সুকুমার জানিয়েছেন : '...আমার জীবনের মধ্যে একটা বড় crisis বা turning point আসছে, সেটা যে কি আমি ঠিক জানি না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে এই বিশ্বাস ক্রমশঃ প্রবল হচ্ছে যে সেটা death ছাড়া আর কিছু নয়।'[১] চিঠি লেখার পাঁচ মাস পরেই সুকুমার কালাজ্বরে আক্রান্ত হন, শেষ পর্যন্ত তাঁর আশঙ্কাই নির্মম সত্য হয়ে দেখা দেয়।

সাময়িকভাবে আবেগজনিত কারণে হলেও তিনি এই সময় সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কাজে এমন কি রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত করার আন্দোলনে বিশ্বাস ও উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন : 'অনেক দিন থেকে মনে

মনে অনুভব করছি যে সমাজের কাজকর্ম্ম ইত্যাদি কোন জিনিসের সঙ্গে আমার মনের মিল নেই, তাতে আমার কোন লাভ নেই এবং লোকসান (real লোকসান) যথেষ্ট।' চিঠির শেষাংশে লিখছেন: 'অনেক কাজ অসম্পূর্ণ বা অর্দ্ধসম্পূর্ণ হ'য়ে আছে, আমি জানি। তা আমাকে আর স্মরণ করিয়ে দিও না। I decline to think about Khasi Mission, about Rabibabu's election & other similar things.'

যেদিন চিঠি লিখছেন, সেদিনই সমাজমন্দিরে আনন্দমোহন বসু স্মৃতি বক্তৃতা সভায় ভাষণ দেবার সময় তাঁর মনে হয়েছে, 'without any previous warning বক্তৃতার দু'এক কথা বল্‌তে গিয়েই আমি অনুভব করলাম, with a horrible shock, যে যা বল্‌তে যাচ্ছি তার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না—অর্থাৎ লোককে শোনাবার মত স্পষ্ট ক'রে বিশ্বাস করি না। বারবার ক'রে বলি, খুব বেশী বেশী ক'রে বলি, এইজন্যেই যে, বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি মনের মধ্যে আছে। আসলে মনে মনে যা বিশ্বাস করি তা ঠিক উল্টো—rampant, morbid out and out pessimism. বল্‌তে চেয়েছিলাম, মানুষের পক্ষে জীবনের প্রসন্নতা রক্ষা করা কত সহজ ও স্বাভাবিক, তা এইরকম জীবন থেকে বোঝা যায়—আর বলতে চেয়েছিলাম প্রত্যেক মানুষের মনের গোপনে বাহিরের সংগ্রামে অনির্ব্বাপিত তার যে আনন্দ, সেই আনন্দ জাগ্রত হ'য়ে থাকে। কিন্তু I heard myself saying যে, এই যুগের মানুষের মন থেকে আশার প্রদীপ নিভে গিয়েছে, মানুষের আনন্দের উৎসমুখ বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, কেউ আশা করতে জানে না, কেউ ভবিষ্যতের কিছু ভরসা রাখে না—ইত্যাদি।'[৩]

এ চিঠির ভাবাবেগের অংশ বাদ দিলে যে সত্যটি উপলব্ধি করা যায়, তা হল তাঁর সংবেদনশীল শিল্পী ও ভাবুকসত্তা ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন আদর্শ ও কর্মধারার ওপর সাময়িকভাবে হলেও বিশ্বাস হারিয়েছিল। অন্যদিকে হাস্যরসের এই অমর শিল্পীর অন্তরতম সত্তা হঠাৎ অবারিত হয়েছে এ চিঠিতে। মানসিক ক্ষমতার যে আশ্চর্য রসায়ন উচ্চশ্রেণীর হাস্যরসের জন্ম দেয়, সেই মনের উপরিতলের নিচে যে এক বেদনাস্তীর্ণ নিমজ্জিত জগৎ আছে তাও ধরা পড়েছে এই চিঠিতে।

এ সত্ত্বেও তাঁর এ অনুভব সাময়িক। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় চেতনা তাঁর সত্তায় ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে ছিল। না হলে মৃত্যুর সাত-আটমাস আগে 'অতীতের ছবি'র মতো গ্রন্থার্ঘ তিনি রচনা করতে পারতেন না। সাময়িক এই আত্মসংকট কাটিয়ে তাঁর মন শেষ পর্যন্ত সহজাত ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চেতনাকেই পুনর্বার আশ্রয় করেছিল।

১: 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র', ৩য় খণ্ড..., পৃ. ২৫৪—২৫৭। ২: তদেব। ৩: তদেব।

৩

দৃশ্যত হাস্যরসিক যে সুকুমারের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজ তাঁর সত্তার অনেকখানি অংশ জুড়ে ছিল। এর প্রমাণ মৃত্যুর কিছুকাল আগে লেখা 'অতীতের ছবি' নামক দীর্ঘ কবিতাটি।

১৩২৯ সালে মাঘোৎসব সপ্তাহের অন্যতম অঙ্গ বালক-বালিকা সম্মেলনে এটি ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে বিতরিত হয়। ছাপা হয়েছিল 'ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স্' থেকে। মূল পুস্তিকাটির প্রচ্ছদে লেখা ছিলঃ 'বালক-বালিকাদের জন্য' / 'অতীতের ছবি' / শ্রীসুকুমার রায়। পুস্তিকাটিতে কোন সাল তারিখ ছিল না। তবে এটি তাঁর রোগশয্যায় লেখা তা জানা যায় একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্ম কালীকৃষ্ণ ঘোষের ২৫ মাঘ, ১৩২৯ তারিখে লেখা একটি চিঠির সূত্র অবলম্বন করেঃ 'তুমি এই মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে "বালক-বালিকাদের জন্য", "অতীতের ছবি", নাম দিয়া যে একখানি পদ্যময় ছোট বই বাহির করিয়াছ তাহা পাঠ করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম।…' 'যাহারা তোমার বর্তমান রুগ্নাবস্থার কথা জানে তাহারা তোমার হৃদয়ের বল দেখিয়া স্তম্ভিত ও উৎফুল্ল হইবে।'[১]

'অতীতের ছবি' একাবলী ছন্দে লেখা ব্রাহ্মসমাজের ভাবাত্মক ইতিহাস। কবিতাটির প্রথম পর্যায়ে জিজ্ঞাসু মানুষের প্রথম জীবন ও জগৎ জিজ্ঞাসা ও ঈশ্বরানুভূতির কথা বলা হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে ঔপনিষদিক ব্রহ্মানুভূতি, ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার বিস্তার, শাস্ত্র ও তর্কের ব্যাসকূট, কুসংস্কার ও আচারে আবদ্ধ গতিহীন সমাজ, বিদেশি শক্তির ভারত-অধিকার, রামমোহনের আবির্ভাব, 'মূর্তিবিহীন' ঈশ্বরোপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের হৃদয়ে পিতামহীর শেষক্রিয়ার সময় একটি ছিন্নপত্রের শ্লোক পাঠে অধ্যাত্ম-অনুভূতির জন্ম ও ব্রাহ্মসমাজে যোগদান, কেশব সেনের আবির্ভাব, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ও এই সমাজের অসংখ্য ত্যাগব্রতী বিশিষ্ট কর্মীবৃন্দের আবির্ভাব—সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করা হইয়াছেঃ

সাধু রামতনু জ্ঞানে প্রবীণ
শিশুর মতন চির নবীন।
শিবচন্দ্র দেব সুধীর মন
কর্মনিষ্ঠাময় সাধু জীবন।

নগেন্দ্রনাথের যুকাতবাণে
কূট তর্ক যত নিমেষে হানে।

… … …

দুর্গামোহনের জীবনগত
সমাজের সেবা দানের ব্রত।
দ্বারকানাথের স্মরণ হয়
ন্যায়ধর্মে বীর অকুতোভয়।

ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন কর্মী ও আদর্শব্রতীদের প্রতি এই ধরণের সশ্রদ্ধ উল্লেখ শিবনাথ শাস্ত্রীও করেছিলেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি হরিণাভি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটি উৎসব হয়েছিল। তাতে যোগ দিয়েছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। উপাসনার আগে নির্জন উদ্যানে একাকী চিন্তা করতে করতে তিনি এইসময় অকস্মাৎ একটি গুরুকীর্তন রচনা করেন। ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্বনামাপুরুষের নামের যোগে তা পূর্ণাঙ্গ আকার দিয়ে প্রতিদিন ভোরে শিবনাথ শাস্ত্রী এর শ্লোকগুলি আবৃত্তি করতেন ঃ

... ...

বৃদ্ধোরামতনুঃ সত্যেসুপ্রতিষ্ঠিতঃ সুনির্ম্মল
রাজনারায়ণঃ সাধুর্ভৃঙ্গো ভক্তি সুধারসে
শিবচন্দ্র মিতাচার আত্মোন্নতিপরায়ণঃ
নবীনো বিনয়াধার শান্তি পরহিত ব্রতঃ
কালীনারায়ণো অগ্রো ভাবধর্ম্মারসামৃতে
নির্ভীকঃ সত্য সংকল্পে দুর্গামোহন এব।
আনন্দমোহন বন্ধু ব্রহ্মার্পিত তনুঃ সুহৃৎ
রামকৃষ্ণঃ শক্তিসিন্ধো মাতৃভাব সমন্বিত

... ...

ধর্ম্মে দৃঢ়মতি সাধ্বী সাফিয়া কলেটাত্মজা
এ তে মে গুরুবঃ সর্ব্বে ঘোষিতঃ পুরুষাশ্চে যে।
স্ব তৈ স্বান্ মহতীং শক্তিং লভেহং ধর্ম্মসাধনে ॥

'সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত নির্ম্মল চরিত্র বৃদ্ধ রামতনু (লাহিড়ী); ভক্তি সুধারসের ভৃঙ্গ সাধু রাজনারায়ণ (বসু); আত্মোন্নতিপরায়ণ মিতাচারী শিবচন্দ্র (দেব); পরহিতব্রতী শান্ত বিনয়ী নবীনচন্দ্র (রায়); ভাবধর্ম্মরসামৃতে মগ্ন কালীনারায়ণ (গুপ্ত); সত্য সংকল্পে নির্ভীক দুর্গামোহন (দাশ) ব্রহ্মার্পিত তনু বন্ধু আনন্দমোহন (বসু); মাতৃভাব-সমন্বিত শক্তিসিন্ধু রামকৃষ্ণ (পরমহংসদেব)।

ধর্ম্মে দৃঢ়মতী সাধ্বী সোফিয়া কলেট; ইঁহারা সকলে আমার গুরু, ইহাদের স্মরণ করিয়া আমি ধর্ম্মসাধনে মহাশক্তি লাভ করি।'[২]

পূর্বসূরীদের প্রতি এই শ্রদ্ধা ও বিনম্র উল্লেখ সুকুমারের 'অতীতের ছবি'তেও আছে।

১ঃ সুকুমার রায় 'সমগ্র শিশুসাহিত্য', ১৯৮০; আনন্দ; পৃ ১৬৬।
২ঃ হেমলতা দেবী, 'শিবনাথ জীবনী', ১৩২৭, পৃ. ২৮৯, ২৯০।

১৯১৫ খ্রি.-এর ডিসেম্বর মাসে উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর পিতার ব্যবসা, 'সন্দেশ' ও পারিবারিক দায়দায়িত্ব এসে পড়ে সুকুমারের ওপর। এই সময় থেকে শুরু করে ১৯২৩ পর্যন্ত সময়কে বলা যেতে পারে সুকুমারের জীবনের সবচেয়ে কর্মবহুল সময়—যদিও শেষ আড়াই বছর মারাত্মক রোগে তা খণ্ডিত। এই সাত / আট বছরেই সুকুমারের সাহিত্যচর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসলগুলি লেখা-রেখায় 'সন্দেশ' পত্রিকাকে ভরে তুলেছিল। পৈত্রিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্ম, মানডে ক্লাব, ব্রাহ্ম-সমাজের বহুমুখী কাজকর্ম, তরুণ ব্রাহ্মগোষ্ঠীর আন্দোলনে নেতৃত্ব, সেক্রেটারিশিপ—ইত্যাদি অজস্র বহুমুখী কাজে নিজেকে নিয়ত ব্যস্ত রেখেছেন। এইসময় শান্তিনিকেতন গেছেন বহুবার, অজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে 'হিন্দুরা ব্রাহ্ম কিনা' বিতর্কে নেমেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, ব্রাহ্ম-সমাজের বিভিন্ন বিশিষ্ট পদের দায়িত্বভার নিয়েছেন, সন্দেশের পাঠকদের কাছে উপেন্দ্র-কিশোরের অভাব পূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন—সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের 'সম্মানিত সভ্য' নির্বাচন করে জীবনের অন্তিম একটি আদর্শের সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে তরুণ ব্রাহ্মদের নেতা হিসেবে প্রবল আত্মশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

এই নিরন্তর কর্মময় জীবনে যে ধীরে ধীরে মৃত্যু যবনিকা টেনে দেবে, সে সময় তা কেউ প্রবল প্রাণশক্তিপরায়ণ এই যুবককে দেখে ভাবতে পারেন নি। ১৯২১ খ্রি.-এর প্রথম দিকে সম্ভবত জানুয়ারি মাসে—ময়মনসিংহে গিয়েছিলেন পৈতৃক জমিদারি দেখাশুনোর জন্যে। উদ্দেশ্য ছিল যথোচিত দেখাশুনোর অভাবে যে সম্পত্তি বন্ধক হয়ে নষ্ট হতে চলেছে, তা বন্ধ করা এবং কিছু অংশের বিক্রি, বিলি-বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করে ইউ. রায় সংস্থার ঋণ পরিশোধ ও শৃংখলা আনা, প্রসার ঘটানো ইত্যাদি।[১]

তাঁর ময়মনসিংহে অবস্থান তাঁর এই ইচ্ছাপূরণের সহায়ক হয়নি। উপেন্দ্র-কিশোরের ভাগের জমিজমার অংশ অনেকটাই দেখাশুনার অভাবে, সৎ ও উপযুক্ত কর্মচারীর অভাবে নীলাম ও পরহস্তগত হয়ে গিয়েছিল। কলকাতাতে খাজনা বাকি বা নীলামের সংবাদ রায় পরিবারের কাছে যে-কোনো কারণেই হোক পৌঁছত না।[২] কোনো কোনো কর্মচারীর অবাঞ্ছিত কাজকর্মের ব্যাপারে ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স্-এর অবস্থাও ছিল জটিল।

এই সময়ে সুকুমার ময়মনসিংহে কিছুদিন কাটিয়ে কলকাতায় ফিরলেন জ্বর নিয়ে। লীলা মজুমদার স্মৃতিকথায় এ সম্পর্কে লিখছেন :

> জমিদারী ব্যাপারে বড়দা ময়মনসিংহে গেছিলেন, ফিরলেন জ্বর নিয়ে। জ্বর মানে কালাজ্বর। তখনো কালাজ্বরের কোনো ভাল ওষুধ বেরোয় নি। লোকে বলত কোনোরকমে যদি কালাজ্বরের

রুগী একটা বছর বেঁচে যায়, তবে আর ও-রোগ তার কিছু করতে পারে না। প্রথমটা কেউ সেরকম ভয় পাই নি।'...

'প্রথম প্রথম বড়দা ওষুধ-পত্র খেতেন, পথ্যি করতেন বটে, কিন্তু ঘরে একখানে গদী আঁটা আরামকেদারায় বসে নিজের কাজকর্ম আগের মতো করে যেতেন। আমরা তাই দেখে আশ্বস্ত হয়ে নিজের কাজে মেতে থাকতাম।'[৩]

এই রোগের প্রথমদিকে চিকিৎসক ছিলেন মান্ডে ক্লাবেরই এক অন্যতম সদস্য ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র।[৪] তিনি তখন মেয়ো হাসপাতালের অধ্যক্ষ। প্রথমে রোগটিকে কালাজ্বর বলে চিহ্নিত করা যায় নি।

এই কালাজ্বর যার বৈজ্ঞানিক নাম 'ভিসারেল লিসমানিয়াসিস্'। উইলিয়াম লিশম্যান ও ট্রেনোভান ১৯০০ খ্রি.-এ প্লীহা থেকে এর রোগজীবাণু আবিষ্কার করেন এবং লিশম্যানের নামটি এই রোগের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। ভারতবর্ষে বৃহত্তম কালাজ্বর মহামারী ঘটেছিল ১৮৯১ থেকে ১৯০০—এই দীর্ঘ সময় ধরে সমগ্র আসামে। অসংখ্য লোকের মৃত্যু হয়েছিল এই রোগে। পরে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জায়গায় এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

বেলেমাছি বা Sand Fly যে এর বীজাণুবাহী—এ তথ্য আবিষ্কৃত হয় ১৯২২ সালে। ১৯২১-এ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী দুজন ডাক্তার ও তিনজন কেমিস্টের সহায়তায় এর ওষুধ আবিষ্কার করেন। ওষুধটির নাম ইউরিয়া স্টিবামাইন। কিন্তু কালাজ্বর কমিশন এই ওষুধকে স্বীকৃত দেয় দীর্ঘসময় পর—১৯২৪ সালে।[৫] স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষাধীন সদ্য আবিষ্কৃত প্রায় অজ্ঞাত ওষুধটি সুকুমারের ওপর প্রয়োগ করা যায় নি।

রোগাক্রান্ত অবস্থায় স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি শান্তিনিকেতন, দার্জিলিং, গিরিডি ইত্যাদি জায়গায় বেশ কিছুদিন করে থাকতেন। দার্জিলিং যান রোগাক্রান্ত হওয়ার বছরেই—১৯২১ সালে। এখানে এসে লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়ামের প্রথম শ্রেণীর একটি কেবিনে থাকতেন।[৬] পরে বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে একটি বাড়িতে উঠে যান। এই অসুস্থ অবস্থার মধ্যেও তাঁর লেখা, ছবি আঁকা অব্যাহত ছিল। লুইস জুবিলিতেই একদিন লেখা হয় বিখ্যাত 'বাবুরাম সাপুড়ে' কবিতাটি।[৭]

সোদপুর-পানিহাটিতে জমিদার গোপালদাস চৌধুরী তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে দরমা দিয়ে ঘিরে সুন্দর থাকার জায়গা করে দিয়েছিলেন। এই সময় তাঁর জলরঙে গঙ্গার শোভা নিয়ে আঁকা একটি চিত্র সন্দেশে ছাপা হয়েছিল।[৮] ১৯২২-এর ডিসেম্বরে বা ১৯২১-এর জানুয়ারির কোন এক সময়ে গিরিডির বারগণ্ডায় অগ্রজ অমল হোমের 'হোমভিলা' বাড়িতেও কিছুদিন বসবাস করেছিলেন। এই সময় স্ত্রী ও অন্যান্য ছাড়াও সঙ্গে ছিল শিশুপুত্র সত্যজিৎ।[৯]

এই সময় মানুডে ক্লাবের অনাহারী সম্পাদক (Honorary Secretary-র সুকুমার কৃত তর্জমা) শিশির কুমার দত্তের স্ত্রী কুমুদিনী দত্তকে কলকাতায় একখানি মজার পত্র-কবিতা লিখে পাঠান। দুরারোগ্য অসুখের মধ্যেও তাঁর অটুট রসবোধের পরিচয় দেয় কবিতাটি। টাইম টেবিল ইত্যাদিতে কলকাতা নামক জায়গা অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্যর্থতা ও নানা সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সঙ্গে কবিতাটিতে আছে—গিরিডি বাসের অনুষঙ্গ ঃ

গিরিধি আরাম পুরী, দেহ মন চিৎপাত ;
খেয়ে শুয়ে হু হু ক'রে কেটে যায় দিনরাত ;
হৈ হৈ হাঙ্গামা হুড়ো তাড়া হেথা নেই ;
মাস বার তারিখের কোনো কিছু ল্যাটা নেই ;
খিদে পেলে তেড়ে খাও, ঘুম পেলে ঘুমিও—
মোটকথা কি আরাম বুঝলে না তুমিও।[১০]

হ য ব র ল সম্ভবত এই সময় লেখা শুরু হয়—এই গিরিডিতে।[১১] অসুস্থ অবস্থার মধ্যে সাহিতাচর্চা, ছবি আঁকা—ইত্যাদির কাজকর্ম ছিল অব্যাহত। 'হ য ব র ল', 'হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী'—অসুস্থ অবস্থার মধ্যেই লেখা। ১৩২৯-এর ভাদ্র থেকে ১৩৩০ ভাদ্র অবধি অর্থাৎ মৃত্যুর ঠিক আগের এক বছরের মধ্যে সন্দেশে বেরিয়েছে 'একুশে আইন', 'বোম্বাগড়ের রাজা', 'বিষম কাণ্ড', 'পালোয়ান' ইত্যাদি বিখ্যাত কবিতা। সত্যজিৎ রায় এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

> রুগ্ন অবস্থাতেও তাঁর কাজের পরিমাণ ও উৎকর্ষ দেখলে অবাক হতে হয়। শুধু লেখা বা আঁকার কাজই নয়, ছাপার কাজেও তিনি অসুখের মধ্যে অনেক চিন্তা ব্যয় করেছেন তারও প্রমাণ রয়েছে। একটি নোটবুকে তাঁর আবিষ্কৃত মুদ্রণ-পদ্ধতির তালিকা রয়েছে। এগুলি পেটেন্ট নেবার পরিকল্পনা তাঁর মনে ছিল কিন্তু কাজে হয়ে ওঠে নি।'
>
> 'লেখা ও আঁকার দিক থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির প্রায় সবই এই আড়াই বছরে।'
>
> 'আবোল তাবোল প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ অর্থাৎ সুকুমারের মৃত্যুর ঠিক নয় দিন পরে। ছাপা বই দেখে না গেলেও, তার তিনরঙা মলাট, তার অঙ্গসজ্জা, পাদপূরক দু-চার লাইনের ছড়া, টেলপিসের ছবি ইত্যাদি সবই তিনি করে গিয়েছিলেন শয্যাশায়ী অবস্থায়।'[১২]

১৯২২ সালে অসুখের মধ্যেই সুকুমার ফেলো অফ্ দ্যা রয়াল ফটোগ্র্যাফিক সোসাইটি (F. R. P. S.) নির্বাচিত হয়েছেন।[১৩] দুরারোগ্য রোগের পরিণতি

কী হতে পারে জেনেও নিজের কর্মে অবিচল ও নিবিষ্ট থাকার এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত তিনি। এইসব লেখা আঁকায় মৃত্যুপথযাত্রীর সুকুমারের কোনো দুঃখ বা বেদনার ছাপ নেই, বরং কৌতুক ও প্রসন্নতায় সে-সব লেখা উজ্জ্বল।

সুকুমারের জীবনের শেষ রচনা 'আবোল তাবোল' নামক কবিতাটি। তাঁর নির্দেশে 'আবোল তাবোল' বই-এর শেষে কবিতাটি ছাপা হয়েছে। একমাত্র এই কবিতাটিতেই আছে মৃত্যুর ছায়া—কিন্তু কৌতুকের ছোঁয়ায় মৃত্যুর অমোঘ নির্মমতা—বিচিত্র রঙীন বর্ণালীতে বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। মৃত্যু নিয়েও কৌতুক করেছেন উজ্জ্বল হাস্যরসের এই দার্শনিক-শিল্পী ঃ

আজকে দাদা যাবার আগে
বলব যা মোর চিত্তে লাগে—
নাই বা তাহার অর্থ হোক
নাই বা বুঝুক বেবাক্ লোক।
... .
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ্ তবলা বাজে—
রাম-খটাখট ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ।
আলোয় ঢাকা অন্ধকার
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।
গোপন প্রাণে স্বপন দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চভূত।
হ্যাংলা হাতী চ্যাং-দোলা
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরাণী পক্ষীরাজ—
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

এই কবিতা লেখার কয়েকদিন পর ১০ সেপ্টেম্বর [২৩ ভাদ্র ১৩৩০ সন] সকালবেলা ৮-১৫ মিনিটে ১০০ নং গড়পার রোডের বাড়িতে ৩৫ বছর ১০ মাস ১০ দিন বয়সে সুকুমারের মৃত্যু হল।[১৪]

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে ধরা আছে সেই অন্তিম মুহূর্ত ও শোকাহত পরিবারের কথা ঃ

'ভোরের দিকে তাঁর জ্ঞান ছিল না। কখনও কখনও কি যেন বলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু পরিষ্কার কিছু বোঝা যাইতেছিল না। হঠাৎ একবার শুনিলাম "এইবার বেরিয়ে পড়ি।" ইহাই তাহার শেষ কথা।'[১৫]

'ট্যাকসি থেকে নেমে দেখলাম এ গড়পার সে গড়পার নয়। এখানে হাসি নেই, কথা নেই, কাজ নেই, আনন্দ নেই। প্রেস বন্ধ প্রেসের ঝমঝম শব্দ বন্ধ।·· সিঁড়ির ধাপে ধাপে লোক দাঁড়িয়েছিল। চেনা লোক প্রায় সবাই কিন্তু সকলকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল।

বসবার ঘরের পাশ দিয়ে বড়দার ঘরে গেলাম। বড়দা চোখ বুজে বুকের ওপর হাত দু'খানি জড়ো করে, একটা নিচু খাটের ওপর শুয়েছিলেন। সাদা কাপড়, সাদা চাদর, সাদা ফুল। বড়দার পায়ের ওপর মুখ থুবড়ে আমার হতভাগিনী জ্যাঠাইমা [বিধুমুখী] পড়েছিলেন। বড়দার পাশে একটা মোড়ার ওপর আমার অনন্য সাধারণ বৌঠান [সুপ্রভা রায] চোখ বুঁজে দু-হাত জড়ো করে বসেছিলেন আর দু'গাল বেয়ে স্রোতের মত জল পড়ছিল।'[১৬]

সুকুমার রায়ের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল। মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও সুকুমারের গভীর মানসিক স্থৈর্য, মনের দীপ্তি, শক্তি ও চারিত্রবলের পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন।

সুকুমারের মৃত্যুর তিনদিন পরে ২৬ ভাদ্র, [১৩৩০ সাল] শান্তি-নিকেতনের মন্দিরের উপাসনা পরবর্তী উপদেশে তিনি সুকুমার রায়কে স্মরণ করে ভাষণ পাঠ করেন। সেই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ শান্ত ও অবিচলিত চিত্তে মৃত্যুকে গ্রহণ করার মধ্যে পূর্ণ ও পরমের প্রকাশ আছে বলে মন্তব্য করে সুকুমার রায়ের মধ্যে সেই অবিচলিত শক্তির কথা উল্লেখ করেন ঃ

জীবলোকের ঊর্ধ্বে অধ্যাত্মলোক আছে যে-কোন মানুষ এই কথাটি নিঃসংশয় বিশ্বাসের দ্বারা নিজের জীবনে সুস্পষ্ট করে তোলেন অমৃতধাম তীর্থযাত্রায় তিনি আমাদের নেতা।

আমার পরম স্নেহভাজন বন্ধু সুকুমার রায়ের রোগশয্যার পাশে এসে যখন বসেছি এই কথাটি আমার বারবার মনে হয়েছে। আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি কিন্তু এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মত অল্পকালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ দান করতে প্রায় আর কাউকে দেখিনি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন। তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ

হয়েছে।...এই কথাটি আজ এত জোরের সঙ্গে আমার মনে বেজে উঠেছে তার কারণ সুদীর্ঘকালের দুঃখভোগের পর জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মত অতবড় বিচ্ছেদকে, প্রাণ যাকে পরম শত্রু বলে জানে, তাকেও তিনি পরিপূর্ণ করে দেখতে পেয়েচেন। তাই আমাকে গাইতে অনুরোধ করেছিলেন—

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে,
তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে।
নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।

যে গানটি তিনি আমাকে দুবার অনুরোধ করে শুনলেন সেটি এই ঃ

দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো, গভীর শান্তি এ যে,
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে উঠল কোথায় বেজে।
ছাড়িয়ে গৃহ, ছাড়িয়ে আরাম, ছাড়িয়ে আপনারে
সাথে করে নিল আমায় জন্ম মরণ মাঝে
এল পথিক সেজে ॥
চরণে তার নিখিল ভুবন নীরবে গগনেতে
আলো আঁধার আঁচলখানি আসন দিল পেতে।
এতকালের ভয় ভাবনা কোথায় যে যায় সরে'
ভালমন্দ ভাঙাচোরা আলোয় ওঠে ভরে'
কালিমা যায় মেজে।
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো, গভীর শান্তি এ যে ॥

মৃত্যুর সম্মুখেও যাঁদের চিত্ত প্রসন্ন ও প্রশান্ত থাকে তাঁরা মৃত্যুর মধ্যেও সেই মূল্যটি দেখতে পান। যিনি সকল সম্বন্ধের সেতু, সকল আত্মীয়তার আধার, বহুর মধ্যে দিয়ে যিনি এক-কে বিধৃত করে রেখেছেন, তাঁরা মৃত্যুর রিক্ততার মধ্যে তাঁকেও সুস্পষ্ট করে দেখতে পান। সেই জন্যই এই মৃত্যু পথের পথিক আমাকে গান গাইতে বলেছিলেন, পূর্ণতার গান, আনন্দের গান।'[১৭]

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর প্রায় ১২।১৩ দিন আগে গড়পারের বাড়িতে সুকুমারকে দেখতে এসেছিলেন। সুকুমার সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে গান গাইতে অনুরোধ করেন। উদ্ধৃত ভাষণে সেই দিনের স্মৃতি স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

সুকুমারের মৃত্যুর পরে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা', 'প্রবাসী' 'বসুমতী' ইত্যাদি সাময়িক পত্রে 'শোক-সংবাদ' প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে 'প্রবাসী' [আশ্বিন, ১৩৩০] পত্রিকা মন্তব্য করে ঃ

'এই হাস্যরসিক যুবকের চরিত্রকে ভগবদ্ভক্তি অনুপম সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছিল।...যুবকেরা কি হারাইলেন, সমাজ কি হারাইলেন, দেশ

কি হারাইলেন, মানব-সমাজ কি হারাইলেন তাহা পরে স্থির চিত্তে বিচার করিলে বুঝা যাইবে। এখন লিখিতে পারিলাম না।'[১৮]

১ঃ মঞ্জিল সেন, 'অদ্বিতীয় সত্যজিৎ', ১৯৮৭, পৃ. ১৭। ২ঃ জানিয়েছেন ঃ শ্রীযুক্তা নলিনী দাশ। ৩ঃ লীলা মজুমদার, 'পাকদণ্ডী'..., পৃ. ১২৪। ৪ঃ শ্রীযুক্তা নলিনী দাশের সূত্রে প্রাপ্ত। ৫ঃ অরুণকুমার চক্রবর্তী, 'চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাঙালী'। ৬ঃ সুশোভন সরকার, 'সুকুমার রায় ঃ বা মনে পড়ে', "বারোমাস", শারদীয় ১৯৮২, পৃ. ৪। ৭ঃ তদেব। ৮ঃ কল্যাণী কার্লেকর, 'সুকুমার রায়,' "সুকুমার সমগ্র রচনাবলী" ১ম খণ্ড, ১৯৭৪, পৃ. ১৮। ৯ঃ অজয় হোম, 'তাতা-কাকা', "এক্ষণ" গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৩৯১, পৃ. ৮৯। ১০ঃ ৮.১.১৯২২ তারিখে শিশির কুমার দত্তের স্ত্রীকে পাঠানো পত্র-কবিতার অংশ বিশেষ। দ্র সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পাতাবাহার', ১৩৬২, পৃ. ৭-১০। ১১ঃ 'তাতাকাকা', পৃ. ৯০। ১২ঃ সত্যজিৎ রায়, 'ভূমিকা', "সমগ্র শিশু সাহিত্য ঃ সুকুমার রায়", ১৩৮৩। ১৩ঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'কারিগরী কল্পনা ও বাঙালী উদ্যোগ', ১৯৮৮, পৃ. ৩০২। ১৪ঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'সুকুমার রায় ঃ জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি', এক্ষণ, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৯৩, পৃ. ২৬৮। ১৫ঃ তদেব। ১৬ঃ 'পাকদণ্ডী', পৃ. ১৪০ ১৭ঃ 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা, ভাদ্র, ১৩৩০, পৃ. ১২৭-১২৯ ['মন্দিরে উপদেশ ঃ সুকুমার রায়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে'] ১৮ঃ 'প্রবাসী', আশ্বিন, ১৩৩০ ["বিবিধ প্রসঙ্গ" ঃ 'শ্রীযুক্ত সুকুমার রায়']

সংযোজন

উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার

১

এক অসাধারণ পুত্রের পিতা উপেন্দ্রকিশোর নিজেও কম অসাধারণ ছিলেন না। ৫৩ বছর আয়ুষ্কালের মধ্যে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও কর্মের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

উপেন্দ্রকিশোর একাধারে আর্টিস্ট, সংগীতজ্ঞ, প্রসেস-বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী ও আবিষ্কারক একমাত্র ভারতীয়, ব্যবসা ও কারিগরী ক্ষেত্রে উদ্যোগী পুরুষ, সর্বোপরি বাংলার শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও লেখক। সুকুমারের কীর্তির প্রায় অধিকাংশ দিকগুলি এই প্রতিভাবান পিতার সাহচর্যে ও শিক্ষায় বিকশিত হয়েছে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়ঃ 'সুকুমারবাবুর বহু সদ গুণ প্রদীপ জ্বালার মতন পিতার নিকট থেকে পাওয়া।'[১]

২

উপেন্দ্রকিশোর তাঁর ছেলেমেয়েদের বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যচর্চায় ও ছবি আঁকায় উৎসাহ দিতেন। আটবছর বয়সে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত সুকুমারের সাহিত্যচর্চার প্রথম ফসল 'নদী' নিশ্চয়ই এই অনুপ্রেরণার সাক্ষাৎ ফল। শুধু সুকুমার নন, তাঁর বাকি পাঁচভাইবোনই সাহিত্যচর্চায় ভবিষ্যৎকালে নিজেদের সুনিপুণ অধিকারের পরিচয় দিয়েছেন।

সুকুমারের ও তাঁর ভাইবোনের ছবি আঁকার চর্চার শুরু বাল্যেই তাঁদের গুণী পিতার উৎসাহে। পুণ্যলতা লিখছেনঃ 'বাবা ছোটবেলা থেকেই আঁকায় উৎসাহ দিতেন। আঁকবার সরঞ্জাম এনে দিতেন, আমরা নিজেদের মনের মতন যার যা ইচ্ছা ছবি আঁকতাম, বাবা দেখে যেটুকু ভাল হয়েছে তার প্রশংসা করতেন, আর দোষ-ত্রুটি যা থাকত তাও সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন। দিদি (সুখলতা), দাদা (সুকুমার) আর টুনীর (শান্তিলতা) ছবি আঁকার হাত খুব সুন্দর ছিল। দাদার প্রধান ঝোঁক ছিল মজার ছবির উপর। দাদার বই খাতা কত মজার মজার ছবিতে ভরা থাকত, পড়ার বইয়ের সাদাকালো ছবিগুলি সব রঙ্গীন হয়ে যেত।'[২]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, উপেন্দ্রকিশোর এ দেশে সে সময়ের পাশ্চাত্য-রীতির চিত্রকরদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা',

'বলরামের দেহত্যাগ', 'চুণার দুর্গ'—এগুলি তাঁর আঁকা বিখ্যাত ছবি। তাঁর শিল্পচর্চা সম্বন্ধে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: 'লেখার বিষয়বস্তু বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের বাইরেও তাঁহার শিল্পীমন বিচরণ করিত। অনেকগুলি পৌরাণিক ঘটনার দৃশ্য ও প্রাচীন ইতিকথার চরিত্র তিনি তেলরঙের মাধ্যমে আঁকিয়াছিলেন। এইগুলি আঁকিবার কার্যরীতি (টেকনিক) বিদেশী ছিল বলা যায়, কেন না তাঁহার দৃশ্যাবলীতে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) এবং মনুষ্য ও জীবজন্তুর শারীর সংস্থান ও শারীরিক অনুপাত বিদেশী চিত্রাংকণের রীতি অনুযায়ী ও যথাযথ হইত।'[৩]

ইলাস্ট্রেশনে অসামান্য দক্ষ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। সুকুমারের ইলাস্ট্রেশন আর শিল্পচর্চার প্রত্যক্ষ প্রেরণা তিনিই। আবার 'নিছক অংকণ কৌশলে সুকুমার উপেন্দ্রকিশোরের সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু কৌশলের অভাব তিনি [সুকুমার] পূরণ করেছিলেন দুটি দুর্লভ গুণের সাহায্যে। এক হল তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, আরেক হল অফুরন্ত কল্পনা-শক্তি।'[৪]

৩

সুকুমার বিজ্ঞানের ছাত্র ও মনোভাবেও যুক্তিবুদ্ধির অধিকারী। বিদেশ থেকে মুদ্রণ ও প্রসেস-বিজ্ঞানে কৃতিত্বের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন। প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের পর তিনিই দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি F.R.P.S. সম্মান লাভ (১২ই ডিসেম্বর, ১৯২২ খ্রি.) করেছিলেন।[৫] কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যেমন প্রসেস-বিজ্ঞানে 'ফটো-গ্রেসিস' পদ্ধতি এবং বাংলা টাইপোগ্রাফি সংক্রান্ত চিন্তা-চর্চা-এ সবের মূলেই আছে সুকুমারের বিজ্ঞানী-পিতার সাহচর্য, শিক্ষা ও প্রেরণা।

উপেন্দ্রকিশোর ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে হাফটোন ছবি ছাপার দুর্গতি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে ফটোগ্রাফি ও প্রসেস-বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে একেবারে গোড়া থেকে জ্ঞানার্জন করতে হয়। ইংলণ্ড থেকে যন্ত্রপাতি ও বই আনিয়ে তিনি এ ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি এ বিষয়ে এতদূর অধিকার অর্জন করেন যে পাশ্চাত্যের প্রসেস-বিজ্ঞানীরা তাঁকে কয়েকটি ক্ষেত্রে আবিষ্কারকের মর্যাদা দেন। উপেন্দ্রকিশোর আবিষ্কৃত নানাপ্রকার ডায়াফ্রাম্, স্ক্রীন অ্যাডজাস্টার, রে-টিণ্ট ও ডুয়োটাইপ পদ্ধতি ইউরোপে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। প্রসেস-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করে **'Process Work and Electro Typing'** পত্রিকায় লেখা হয় যে তিনি এ ব্যাপারে ইউরোপীয় ও আমেরিকান বিজ্ঞানীদের চেয়ে এগিয়ে আছেন: **'Mr. U. Roy of Calcutta is far ahead of European and American workers in originality. Which is all**

the more surprising when we consider how far he is from the hub-centres of process work.'[৬]

উপেন্দ্রকিশোরের প্রসেস-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি ইংলন্ডের ফটো-টেকনিক শাখার কিছু কিছু সেরা পত্রিকায় ছাপা হত। এই পত্রিকাগুলি হল Pensose's Pictorial Annual, Process Work ইত্যাদি। পেনরোজ সচিত্র বার্ষিকীতে উপেন্দ্রকিশোরের মোট ন'টি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। এই পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোরের গবেষণার প্রসঙ্গ নিয়ে সম্পাদকীয়ও লিখেছিলেন। এ ছাড়া ফ্রান্সের Le Procede এবং আমেরিকায় The Inland Printer ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পত্র-পত্রিকায় উপেন্দ্রকিশোরের গবেষণা প্রশংসিত হয়েছিল। ব্লক নির্মাণে 'হাফটোন' জাতীয় কাজে বর্তমান উন্নতি যে তাঁর পন্থা ধরে হয়েছিল, একথা কেউ কেউ উল্লেখও করেছেন।[৭]

হাতে কলমে পিতার কাছে কাজ শেখার পর সুকুমার মুদ্রণ ও প্রসেস-বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলেত গেছেন; পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেখানকার নানান পত্র-পত্রিকায় এবিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। উপেন্দ্রকিশোরের শিক্ষা যে সুকুমারের স্বল্পায়ু জীবনে সার্থকতার পথে এগোচ্ছিল তা বোঝা যায় সুকুমারের ফটো-স্ক্রেসিস ইত্যাদি পদ্ধতি আবিষ্কারের মধ্যে। তাঁর অকালমৃত্যুর ফলে এটি পেটেন্ট নেওয়া সম্ভব হয়নি।

১৯১৫ খ্রি-এর ডিসেম্বর মাসে উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর সুকুমারের ওপর এসে পড়ে পত্রিকা ও অন্যান্য দায়িত্বের সঙ্গে কারখানাটি চালিয়ে যাবার দায়িত্ব। সুকুমার যে যোগ্য পিতার যোগ্যপুত্র হিসেবে কাজ চালিয়ে গেছেন, তা বোঝা যায় এই সময় তৈরি বিভিন্ন ধরনের ব্লক ও ছাপা ছবি থেকে। এই সব উন্নতমানের ছবিগুলি ছড়িয়ে আছে 'প্রবাসী', 'সন্দেশ' ইত্যাদি পত্রিকায় এবং নানা গ্রন্থে। বিজ্ঞান ও কারিগরী শিল্পের একটি শাখায় এই অসামান্য অধিকার সম্ভব হয়েছিল—বিজ্ঞানী-পিতার শিক্ষা ও সাহচর্যের ফলেই।

উপেন্দ্রকিশোর ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহ দিতেন। পুরাতত্ত্ব, পুরাবস্তু ইত্যাদির ধারণার জন্য মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া, আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বিভিন্ন পশুপক্ষীর জাতি ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, সূর্যগ্রহণের সময় ছেলেমেয়েদের গ্রহণ দেখায় উৎসাহ দেওয়া বা রাতে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দূরবীণ দিয়ে গ্রহতারার পরিচয় করানো তাঁর শিক্ষাদানের অন্যতম অঙ্গ ছিল।

বিজ্ঞানী পিতার সাহচর্যে এইভাবেই সুকুমারের মধ্যে গড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা। সুকুমারের ননসেন্স-প্রতিভার বিকাশেও এই মানসিকতার প্রভাব আছে। যাঁরা উদ্ভটসাহিত্য সৃষ্টি করেন স্বভাবে ও কর্মে তাঁদের বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা ও যুক্তিবোধ থাকে বলেই তার বৈপরীত্যে আবোল তাবোলের নিয়মহীন জগৎ রচনা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়।

উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর ওই বছর জানুয়ারি মাসের 'সন্দেশ' পত্রিকায় লেখা হয় (সম্ভবত এ লেখা সুকুমারেরই): 'তোমরা তাঁহাকে না চিনিলেও, তিনি তোমাদিগকে বাঙলার সকল বালক-বালিকাকে, শিশুদের মনটিকে বেশ চিনিতেন। তাই যেটি বলিলে আর যেমনভাবে বলিলে বেশ সহজে তোমরা বুঝিবে, তোমাদের মনের মতো হইবে, তোমাদের প্রতি গভীর স্নেহ পরবশ হইয়া বহু পরিশ্রম ও যত্ন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও নিপুণতা প্রয়োগে তোমাদের শিক্ষা ও আমোদ দিতে, তোমাদিগকে ফূর্তি দিয়া ভালো করিতে সর্বদা চেষ্টা করিতেন।'[৮]

উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিভা ও কর্মধারা বহুমুখী হলেও উপেন্দ্রকিশোর মূলত শিশুসাহিত্যের জন্য স্মরণীয়; এক্ষেত্রে তাঁর আত্মোৎসর্গীকৃত ভূমিকা ও অবদান ছড়িয়ে আছে সন্দেশের পাতায় পাতায়। শিশুদের শব্দভাণ্ডার (vocabulary) সম্বন্ধে সচেতন থেকে সরল ও মনোহর ভাষায় তাদের উপযোগী সাহিত্য-রচনা, সুমুদ্রিত চিত্তাকর্ষক ছবি, উন্নতমানের ইলাসট্রেশন, প্রতিমাসে বিভিন্ন ধরনের গল্প, কবিতা, সন্দর্ভ, ধাঁধা ইত্যাদি রচনার মধ্যে দিয়ে উপেন্দ্রকিশোর তাঁর জীবৎকালে সন্দেশের পাতা ভরিয়ে রেখেছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোরের অসুস্থতার সময় থেকে সন্দেশ-এর প্রয়োজন মেটানোর জন্য সুকুমারের আঁকা লেখার পরিমাণ বেড়েছে। আর উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর আকস্মিক শূন্যতাকে ভরাতে সুকুমারকে প্রায় সব্যসাচীর ভূমিকা নিতে হয়েছে। সুকুমারের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বুঝতে গেলে সুকুমারের মৃত্যুর পর সুবিনয় রায় সম্পাদিত সন্দেশগুলির তুলনা করলে বোঝা যাবে। সুবিনয় রায় সম্পাদিত সন্দেশে আঁকা ছবি ও মৌলিক ইলাসট্রেশনের পরিমাণ কমেছে। বিদেশী পত্র-পত্রিকা গ্রন্থাদি থেকে ছবি ও লেখার বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হয়েছে বেশি। কোথাও যে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে—এ সময়ের সন্দেশের সঙ্গে সুকুমারের যুগের সন্দেশের তুলনা করলে তা বেশ বোঝা যায়। আবার সুকুমারের লেখা ও আঁকার অনবদ্যতা স্বীকারের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, উপেন্দ্রকিশোর 'সন্দেশ' প্রতিষ্ঠা না করলে আমরা সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিককে এভাবে পেতাম কিনা সন্দেহ।

৪

ধার্মিকতা ও চারিত্রশক্তি বংশধারার সঙ্গে সুকুমার অনেকটাই পেয়েছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। তাঁর মৃত্যুর পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখে: 'ব্রাহ্ম-সমাজের ভিতরে এত নম্রতা এত ধীরতা এত কর্তব্যনিষ্ঠা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত আলাপের সময় স্বচ্ছ সরোবরের অন্তস্তলের ন্যায় তাঁহার চরিত্রগত সরলতার যে চিত্র দর্শন করিয়াছি, তাহা

নিতান্তই দুর্লভ।...তিনি নামে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইলেও তাঁহার জীবন ব্রাহ্মসমাজের কোনো সম্প্রদায়ের নিজস্ব ছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।'[৯]

ব্রাহ্ম-পিতার আদর্শকে অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত কর্ম-কাণ্ডে নিজেকে অনেক বেশি প্রসারিত করেছিলেন সুকুমার। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠান, উপাসনা, আচার্যের দায়িত্ব, ভাষণ, যুব-সমাজের নেতৃত্বদান, ব্রাহ্ম-সম্মিলনীতে প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত সুকুমারের ব্রাহ্মসমাজ-সংক্রান্ত কাজগুলি। আবার উপেন্দ্রকিশোরের মতই তাঁকেও কোনো ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। সুকুমারের চারিত্রিক মাধুর্য ও ধর্মভাবের কথা তাঁর সহযোগী সতীর্থরা স্বীকার করেছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সুকুমারের মৃত্যুপরবর্তী শ্রদ্ধার্ঘে এই গুণগুলির কথা উল্লেখ করেছিল: 'চরিত্রের মাধুর্যে ইনি সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিতেন। ভগবৎ বিশ্বাসে ইনি আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের আদর্শস্থল ছিলেন।'[১০]

পুত্রের সাহিত্যিক প্রতিভা পুরোপুরি দেখে না গেলেও, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ সার্থক হয়েছে এটা উপেন্দ্রকিশোর অনুভব করেছিলেন। একটি মন্তব্যে এর প্রমাণ আছে: '. শুনেছি একবার একজন উপেন্দ্রবাবুকে [উপেন্দ্রকিশোরকে] বলেছিলেন, আপনার ছেলে আপনারই উপযুক্ত হয়েছে। তাতে উপেন্দ্রবাবু বলেন, "আমার চেয়ে আমার ছেলে অনেক ভালো হয়েছে।"'[১১]

১: চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্বর্গীয় সুকুমার রায়', "সন্দেশ", আশ্বিন, ১৩৩০ ২: পুণ্যলতা..., পৃ. ৮৫। ৩: কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'উপেন্দ্রকিশোর', "বিশ্বভারতী পত্রিকা" কার্তিক-পৌষ ১৩৭০, পৃ. ১১৩। ৪: সত্যজিৎ রায়, 'ভূমিকা', সমগ্র শিশুসাহিত্য: সুকুমার রায়, ১৯৮৩। ৫: The Royal Photographic Society-র সূত্রে প্রাপ্ত। ৬: কেদারনাথ..., পৃ. ১১৬। ৭: তদেব। ৮: 'স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর', "সন্দেশ", মাঘ, ১৩২২। ৯: 'শোক-সংবাদ', "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা", ফাল্গুন ১৮৩৭ শক। ১০: "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা", আশ্বিন ১৯৩১। ১১: সুধীরকুমার চৌধুরী, 'তাতাবাবু', "দৈনিক কবিতা", ২৫ বৈশাখ, ১৩৮০।

পরিশিষ্ট

সুকুমারের মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিনী সুপ্রভাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার এই গভীর শোকে তোমাকে সান্ত্বনা দেবার যোগ্য কোনো কথা আমি জানি নে। দুই বৎসরের অধিককাল অক্লান্ত যত্নে নিরন্তর তুমি তোমার স্বামীর সেবা করে এসেচ। তোমার শুশ্রূষার সেই পবিত্র ছবিটি আমি কখনও ভুলব না। আজ তোমার অন্তর্যামী তোমার আহত হৃদয়ের শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করুন। আমি রোগশয্যায় যখনি সুকুমারকে দেখতে গিয়েচি আমার অনেক সময় মনে হয়েচে যে, তোমরা যারা নিয়ত তাঁর সেবার ভার নিয়েচ তোমরা ধন্য, কেননা, দুঃসহ ও সুদীর্ঘকাল ব্যাপী রোগতাপের ভিতর দিয়ে মানুষের এমন আশ্চর্য মাহাত্ম্যের প্রকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আমি নিশ্চয় জানি তাঁর মৃত্যু শয্যা থেকে তোমার জীবনের একটি মহৎ দীক্ষা তুমি লাভ করেচ, আজ দুর্দ্দিনে সেই দীক্ষাই তোমাকে রক্ষা করবে। রোগের পীড়নের মধ্যে তাঁর অক্ষুব্ধ ধৈর্য ও চিরপ্রসন্নতা, মৃত্যুর ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়েও ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা, দিব্যবাণীর মত বারবার আমার চিত্তকে অধিকার করেচে—আসন্ন মৃত্যুর কুহেলিকা ভেদ করে' অপরাজিত আত্মার এই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিটি দেখতে পেয়েচি। এ'কে আমি সৌভাগ্য বলে মনে করি। মৃত্যুকে তিনি মহীয়ান করে', তাকে অমৃতলোকের সিংহদ্বার করে' দেখিয়ে গেছেন, আমরা যারা মর্ত্ত্যলোকে আছি, আমাদের প্রতি তাঁর এই একটি মহার্ঘ্য দান। এই কথা স্মরণ করে' তুমি সান্ত্বনা লাভ কর ; ঈশ্বর তোমায় শান্তি দিন, তোমার শোককে কল্যাণে সার্থক করুন।

এই আমার অন্তরের কামনা। ইতি ২৪শে ভাদ্র, ১৩৩০

ব্যথিত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[উৎস : 'আনন্দমেলা', ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ সুকুমার রায় সংখ্যা, পৃ. ৪৮]।

'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা

'ভাদ্র, সন ১৩৩০ ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা'

২৬শে ভাদ্র

'মন্দিরের উপদেশ'

('সুকুমার রায়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে')

[সুকুমারের মৃত্যুর তিনদিন পরে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে উপাসনার পর রবীন্দ্রনাথের ভাষণ]

মানুষ যখন সাংঘাতিক রোগে পীড়িত, তখন মৃত্যুর সঙ্গে তার প্রাণশক্তির সংগ্রামটাই সকলের চেয়ে প্রাধান্যলাভ করে। মানুষের প্রাণ যখন সঙ্কটাপন্ন তখন সে যে প্রাণী এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্যান্য জীবের মতই আমরা যে কেবলমাত্র প্রাণী মানুষের এই পরিচয় ত সম্পূর্ণ নয়। যে প্রাণশক্তি জন্মের ঘাট থেকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছিয়ে দেয় আমরা তার চেয়ে বড় পাথেয় নিয়ে জন্মেছি। সেই পাথেয় মৃত্যুকে অতিক্রম করে' আমাদের অমৃত-লোকে উত্তীর্ণ করে' দেবার জন্যে। যারা কেবল প্রাণীমাত্র, মৃত্যু তাদের পক্ষে একান্ত মৃত্যু। কিন্তু মানুষের জীবনে মৃত্যুই শেষ কথা নয়। জীবনের ক্ষেত্রে অনেক সময় এই কথাটি আমরা ভুলে যাই। সেই জন্যে সংসারে জীবন-যাত্রার ব্যাপারে ভয়ে, লোভে, ক্ষোভে পদে পদে আমরা দীনতা প্রকাশ করে থাকি। সেই আত্মবিস্মৃতির অন্ধকারে আমাদের প্রাণের দাবী উগ্র হয়ে ওঠে, আত্মার প্রকাশ ম্লান হয়ে যায়। জীবলোকের ঊর্ধ্বে অধ্যাত্মলোক আছে যে কোনো মানুষ এই কথাটি নিঃসংশয় বিশ্বাসের দ্বারা নিজের জীবনে সুস্পষ্ট করে তোলেন অমৃতধামের তীর্থযাত্রায় তিনি আমাদের নেতা।

আমার পরম স্নেহভাজন বন্ধু সুকুমার রায়ের রোগশয্যার পাশে এসে যখন বসেছি এই কথাই বারবার আমার মনে হয়েছে। আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি কিন্তু এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মত, অল্পকালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্য দান করতে প্রায় আর কাউকে দেখি নি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন। তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েছে।

আমাদের প্রাণের বাহন দেহ যখন দীর্ঘকাল অপটু হয়, শরীরের ক্রিয়া বাধা-গ্রস্ত হয়ে যখন বিচিত্র দুঃখদুর্বলতার সৃষ্টি করে, তখন অধিকাংশ মানুষ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে পারে না, তার সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু

মনুষ্যত্বের সত্যকে যাঁরা জানেন তাঁরা এই কথা জানেন যে, জরা মৃত্যু রোগ শোক ক্ষতি অপমান সংসারে অপরিহার্য, কিন্তু তার উপরেও মানবাত্মা জয়লাভ করতে পারে এইটেই হল বড় কথা। সেইটে প্রমাণ করবার জন্যেই মানুষ আছে, দুঃখ তাপ থেকে পালাবার জন্যে নয়। যে শক্তির দ্বারা মানুষ ত্যাগ করে, দুঃখকে ক্ষতিকে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সেই শক্তিই তাকে বুঝিয়ে দেয় যে তার অস্তিত্বের সত্যটি সুখ দুঃখ বিক্ষুব্ধ আয়ুষ্কালের ছোট সীমানার মধ্যে বন্ধ নয়। মর্ত্যপ্রাণের পরিধির বাইরে মানুষ যদি শূন্যকেই দেখে তাহলে সে আপনার প্রাণটুকুকে বর্ত্তমানের স্বার্থ ও আরামকে একান্ত করে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তিকে আপনার মধ্যে অনুভব করচে বলেই মৃত্যুর অতীত সত্যকে শ্রদ্ধা করতে পেরেচে।

জীবনের মাঝখানে মৃত্যু যে বিচ্ছেদ আনে তাকে ছেদরূপে দেখে না সেই মানুষ যে নিজের জীবনেরই মধ্যে পূর্ণতাকে উপলব্ধি করেচে। যে মানুষ রিপুর জালে বন্দীকৃত, পরকে যে আপন করে জানে নি, বৈষয়িকতার বৃহৎ বিশ্ব থেকে যে নির্ব্বাসিত, মৃত্যু তার কাছে নিরবচ্ছিন্ন ভয়ঙ্কর। কেন না জগতে মৃত্যুর ক্ষতি একমাত্র আমি-পদার্থের ক্ষতি। আমার সম্পত্তি, আমার উপকরণ দিয়ে আমার সংসারকে আমি নিরেট করে তুলছিলেম, মৃত্যু হঠাৎ এসে এই আমি-জগৎটাকে ফাঁকা করে দেয়। যে-আমি নিজের আশ্রয় নিজেদের জন্যে স্থূল বস্তু চাপা দিয়ে কেবলি ফাঁক ভরাবার চেষ্টায় দিনরাত নিযুক্ত ছিল, সে এক মুহূর্তে কোথায় অন্তর্ধান করে এবং জিনিসপত্রের স্তূপ পুঞ্জীভূত নিরর্থকতা হয়ে পড়ে থাকে। সেইজন্যে যে বিষয়ী, যে আত্মম্ভরী মৃত্যু তার পক্ষে একান্তই ফাঁকি। আমিকে যে জীবনে যে অত্যন্ত বড় করে নি সেই ত মৃত্যুকে সার্থক করে জানে।

সাহিত্য চিত্রকলায় ব্যঞ্জনাই রসের প্রধান আধার। এই ব্যঞ্জনার মানে, কথাকে বিরল করে' ফাঁকের ভেতর দিয়ে ভাবের ধারা বইয়ে দেওয়া। বাক্য ও অলঙ্কারের বিরলতার ভিতর দিয়ে যাঁরা ইঙ্গিতেই রসকে নিবিড় করেন তারাই গুণী, আর যাঁদের ভাবুক দৃষ্টিতেই সেই বিরলতাই রসে পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় তাঁরাই রসজ্ঞ। ভাবের মহলে যাঁরা অর্ব্বাচীন তারা উপকরণকেই বড় করে দেখে সত্যকে নয়। সুতরাং উপকরণের ফাঁক তাদের কাছে সম্পূর্ণই ফাঁক। তেমনি নিজের আয়ুকালটাকে যে মানুষ "আমি" ও "আমির" আয়োজন দিয়েই ভরিয়ে দেয়, সেই মানুষের মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনা থাকে না—সেই জন্যে মৃত্যু তার পক্ষে একান্ত মৃত্যু।

দিনের বেলাটা কর্ম্ম দিয়ে খেলা দিয়ে ভরাট থাকে। রাত্রি যখন আসে, শিশু তখন ভয় পায়, কাঁদে। প্রত্যক্ষ তার কাছে আচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে সে মনে করে সবই বুঝি গেল। কিন্তু আমরা জানি, ছেদ ঘটে না, রাত্রি দিনকে ধাত্রীর মত অঞ্চলের আবরণের মধ্যে পালন করে। রাত্রিতে অন্ধকারের কালো

ফাঁকটা যদি না থাকত তাহলে নক্ষত্রলোকের জ্যোতির্ম্ময় ব্যঞ্জনা পেতুম কেমন করে? সেই নক্ষত্র আমাদের বলচে, তোমার পৃথিবী ত এক ফোঁটা মাটি, দিনের বেলায় তাকেই তোমার সর্ব্বস্ব জেনে আঁকড়ে পড়ে আছ। অন্ধকারে আমাদের দিকে চেয়ে দেখ—আমরাও তোমার। আমাদের নিয়ে আর তোমাকে নিয়ে এক হয়ে আছে এই বিশ্ব, এইটেই সত্য। অন্ধকারের মধ্যে নিখিল বিশ্বের ব্যঞ্জনা যেমন, মৃত্যুর মধ্যেও পরমপ্রাণের ব্যঞ্জনা তেমনি।

আমরা ফাঁক মানব না। ফাঁক মানাই নাস্তিকতা। চোখে যেখানে ফাঁক দেখি আমাদের অন্তরাত্মা সেইখানে যেন পূর্ণকে দেখে। আমার মধ্যে এবং অন্যের মধ্যে মানুষে মানুষে ত আকাশগত ফাঁক আছে; যে লোক সেই ফাঁক-টাকেই অত্যন্ত বেশি করে সত্য জানে সেই হল স্বার্থপর, সেই হল অহংনিষ্ঠ। সে বলে, ও আলাদা, নামে আলাদা। মহাত্মা কাকে বলি যিনি সেই ফাঁককে আত্মীয় সম্বন্ধের দ্বারা পূর্ণ করে জানেন, জ্যোতির্ব্বিৎ যেমন করে জানেন যে পৃথিবী ও চন্দ্রের মাঝখানকার শূন্য পরস্পরের আত্মীয়তার আকর্ষণ সূত্র বহন করচে। এক দেশের মানুষের সঙ্গে আরেক দেশের মানুষের ফাঁক আরো বড়। শুধু আকাশের ফাঁক নয়, আকারের ফাঁক, ভাষার ফাঁক, ইতিহাসের ফাঁক। এই ফাঁককে যারা পূর্ণ করে দেখতে পারলে না তারা পরস্পর লড়াই করে', পরস্পরকে প্রতারণা করে মরচে। তারা প্রত্যেকেই "আমরা বড়", "আমরা স্বতন্ত্র" এই কথা গর্ব করে' জয়ডঙ্কা বাজিয়ে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে। অন্ধ যদি বুক ফুলিয়ে বলে, "আমি ছাড়া বিশ্বে আর কিছুই নেই" সে যেমন হয় এও তেমনি। আমাদের ঋষিরা বলেছেন, পরকে যে আত্মবৎ দেখেচে সেই সত্যকে দেখেচে। কেবল কুটুম্বকে কেবল দেশের মানুষকে আত্মবৎ দেখা নয়, মহাপুরুষেরা বলেছেন শত্রুকেও আত্মবৎ দেখ্‌তে হবে। এই সত্যকে আমি আয়ত্ত করতে পারি নি বলে' একে অসত্য বলে উপহাস করতে পারব না, এঁকে আমার সাধনার মধ্যে গ্রহণ করতে হ'বে। কেননা পূর্ণ স্বরূপের বিশ্বে আমরা ফাঁক মানতে পারব না। এই কথাটি আজ এত জোরের সঙ্গে আমার মনে বেজে উঠেচে তার কারণ, সেদিন সেই যুবকের মৃত্যুশয্যায় দেখলুম সুদীর্ঘকাল দুঃখভোগের পরে' জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মত অতবড় বিচ্ছেদকে, প্রাণ যাকে পরম শত্রু বলে' জানে, তাঁকেও তিনি পরিপূর্ণ করে দেখ্‌তে পেয়েচেন। তাই আমাকে গাইতে অনুরোধ করেছিলেন—

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে,
নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।"

যে গানটি তিনি আমাকে দু'বার অনুরোধ করে শুনলেন সেটি এই:

দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো, গভীর শান্তি এ যে,
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে উঠ্‌ল কোথায় বেজে।

ছাড়িয়ে গৃহ, ছাড়িয়ে আরাম, ছাড়িয়ে আপনারে
সাথে করে নিল আমায় জন্ম মরণ পারে,
এল পথিক সেজে ॥

চরণে তার নিখিল ভুবন নীরব গগনেতে
আলো আঁধার আঁচলখানি আসন দিল পেতে।
এতকালের ভয় ভাবনা কোথায় যে যায় সরে'
ভালোমন্দ ভাঙা চোরা আলোয় ওঠে ভরে'
কালিমা যায় মেজে।
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো গভীর শান্তি এ যে ॥

জীবনকে আমরা অত্যন্ত সত্য বলে অনুভব করি কেন? কেন না এই জীবনের আশ্রয়ে আমাদের চৈতন্য বহু বিচিত্রের সঙ্গে আপনার বহুবিধ সম্বন্ধ অনুভব করে। এই সম্বন্ধ বোধ বর্জিত হয়ে থাকলে আমরা জড় পদার্থের মত থাকতুম, সকলের সঙ্গে যোগে নিজেকে সত্য বলে উপলব্ধি করতে পারতুম না। এই সুযোগটি দিয়েচে বলেই প্রাণকে এত মূল্যবান জানি। মৃত্যুর সম্মুখেও যাঁদের চিত্ত প্রসন্ন ও প্রশান্ত থাকে তাঁরা মৃত্যুর মধ্যেও সেই মূল্যটিকে দেখতে পান। যিনি সকল সম্বন্ধের সেতু, সকল আত্মীয়তাব আধার, বহুর মধ্য দিয়ে যিনি এককে বিধৃত করে রেখেছেন, তাঁরা মৃত্যুর রিক্ততার মধ্যে তাঁকে সুস্পষ্ট করে দেখ্‌তে পান। সেইজন্যই এই মৃত্যুপথের পথিক আমাকে গান গাইতে বলেছিলেন, পূর্ণতার গান, আনন্দের গান। তাঁকে গান শুনিয়ে ফিরে এসে সে রাত্রে আমি একলা বসে ভাবলুম, মৃত্যু ত জীবনের সব শেষের ছেদ, কিন্তু জীবনেরই মাঝে মাঝেও ত পদে পদে ছেদ আছে। জীবনের গান মরণের কালে এসে থামে বটে, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত তার তাল ত কেবলি মাত্রায় মাত্রায় ছেদ দেখিয়ে যায়। সেই ছেদগুলি যদি বেতাল না হয় যদি তা ভিতরে ভিতরে ছন্দোময় সঙ্গীতের দ্বারা পূর্ণ হয় তাহলেই শমে এসে আনন্দের বিচ্ছেদ ঘটে না। কিন্তু ছেদগুলি যদি সঙ্গীতকে, পূর্ণতাকে বাধা দিয়ে চলে, তাহলেই শম একেবারে নিরর্থক হয়ে ওঠে। জীবনের ছেদগুলি যদি ত্যাগে, ভক্তিতে, পূর্ণস্বরূপের কাছে আত্মনিবেদনে ভরিয়ে রাখতে পারে,—মৌচাকের কক্ষগুলি মৌমাছি যেমন মধুতে ভরিয়ে রাখে,—তাহলে যাই ঘটুক না কিছুতেই ক্ষতি নেই। তাহলে শূন্যই পূর্ণের উপমাকে বহন করে। বিশ্বের জন্মকুহর থেকে নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে ওঁ, হাঁ—আমি আছি। আমাদের অন্তর থেকে আত্মা সুখে দুঃখে উৎসব শোকে সাড়া দিক্ ওঁ, হাঁ, সব পূর্ণ, পরিপূর্ণ! বলুক,

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে ॥

'সন্দেশ'

আশ্বিন, ১৩৩০

স্বর্গীয় সুকুমার রায়

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"সন্দেশ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় আমাদের নিরাশ করিয়া শোকাচ্ছন্ন করিয়া গত ১০ই সেপ্টেম্বর বেলা ৮-১৫টার সময় পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

সুকুমারবাবু স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। তাঁহার জন্ম হয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ১২৯৪ সালের ১৩ই কার্ত্তিক। মৃত্যুর সময় তাঁহাব বয়স ৩৬ বৎসর পূর্ণও করে নাই। এই অল্প বয়সেই সুকুমারবাবু নানা ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষত্বের চরম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

সুকুমারবাবুকে চিনিতে হইলে তাঁহার পিতৃপরিচয়ও একটু জানা দরকার, কারণ সুকুমারবাবুর বহু সদ্‌গুণ প্রদীপ হইতে প্রদীপ জ্বালার মতন পিতাব নিকট হইতে পাওয়া। উপেন্দ্রকিশোর-বাবু এমন বিনয়ী মিষ্টস্বভাব লোক ছিলেন যে, তাঁহাকে জানা মাত্রেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত ভালোবাসা। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর আমার একটা বিশেষ চেষ্টা ছিল আমি তাঁহাকে আগে নমস্কার করিব, কিন্তু কখনো পারি নাই, দেখা হইবা মাত্র তিনি এত অবনত হইয়া নমস্কার করিতেন যে আমি লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতাম—কারণ, তিনি আমার চেয়ে সকল রকমেই বড় ছিলেন—বয়সে, জ্ঞানে, কৃতিত্বে, প্রতিষ্ঠায়, চরিত্রে। উপেন্দ্রকিশোরবাবু সঙ্গীতবিদ্যা ও চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন ; চিত্র ছাপিবার হাফ্‌টোন-ব্লক প্রস্তুত করিবার প্রথা তিনিই এদেশে প্রবর্ত্তন করেন ও বহু নূতন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়া ঐ বিদ্যার উন্নতি করেন ; শিশুসাহিত্য রচনায় তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের সাক্ষী "ছেলেদের রামায়ণ" ও "ছেলেদের মহাভারত"।

এই অশেষগুণসম্পন্ন পিতার পুত্র সুকুমার-বাবু বাল্যকাল হইতেই নানা বিষয়ে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিয়া দুই বিষয়ে সম্মানের (অনার্স) সহিত বি-এস্‌সি পাশ করেন। পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। সেদিন তাঁকে বিদায় দিতে হাবড়া-ষ্টেশনে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে আমরাও ছিলাম—সেই সৌম্যমূর্ত্তির হাস্যমুখ এখনো মনে পড়িতেছে, সেই হাসিতে সঙ্কল্প ও আশা জ্বলজ্বল করিতেছিল।

বিলাতের ম্যাঞ্চেস্টার-শিল্প কলেজে ফোটোগ্রাফী এবং ফোটোগ্রাফিক প্রক্রিয়া

অনুসারে ছবির ব্লক প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া, সেখানে স্বকীয় গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া, যশোমণ্ডিত সুকুমারবাবু দেশের কর্ম্মক্ষেত্রে যেদিন ফিরিয়া আসিলেন, সেদিনও তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে আমরা হাবড়া-ষ্টেশনে গিয়াছিলাম।

তাহার পর বহু বৎসর তাঁহার সঙ্গে বন্ধুভাবে একত্রে যাপন করিয়া, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জানিবার অবসর পাইয়াছিলাম। সুকুমার-বাবুর সঙ্গে পরিচয়ের পর যে গুণ সর্ব্বাগ্রে লোকের কাছে ধরা পড়িত, তাহা হইতেছে তাঁহার রসিকতা ও তেজস্বিতা। তাঁহার বাক্য ছিল সরস, তাঁহার রচনা ছিল সরস, তাঁহার সঙ্গ ছিল সরস, তাঁহার ব্যবহার ছিল সরস। আনন্দময়তা তাঁহার স্বভাব ছিল। এই আনন্দময়তা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল বলিয়া তিনি বন্ধু-মজ্‌লিসে আনন্দের কেন্দ্র হইতেন, এবং যাহা কিছু রচনা করিতেন তাহা আনন্দে অভিষিক্ত হইত। শিশুদের উপযোগী-কবিতা লেখা বড় শক্ত কাজ; এই কাজে প্রথম কৃতিত্ব দেখান শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সর্‌কার এবং পরে নানা-রকমে কৃতিত্ব দেখান সুকুমার-বাবু। বিমল হাসির কবিতা লিখিতে সুকুমারবাবু সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেইসব কবিতার ছন্দ নিখুঁত, মিল আশ্চর্য্যজনক ও বিষয় নূতন হইত। তাঁহার "খাওয়া" ও "পড়া" সম্বন্ধে কবিতা দুটি বঙ্গভাষায় ভাষা-তত্ত্বের দিক্‌ হইতেও বিশেষ সমাদৃত হইবে—আমরা যে কত বিভিন্ন অর্থে খাওয়া ও পড়া শব্দ ব্যবহার করি তাহা তিনি হাস্যের সূত্রে একত্রে গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আর তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব বাংলায় "আবোল-তাবোল" কবিতা রচনার প্রবর্ত্তনে। রচনার অবলম্বন কোনো বিষয় নয়, পূর্ব্বাপর কথার কোনো সঙ্গতি নাই, অথচ সেটি সুখপাঠ্য সরল কবিতা হইবে—এরূপ রচনা অত্যন্ত কঠিন; এই কঠিন কর্ম্মে অবলীলাক্রমে তাঁহার লেখনী নিযুক্ত হইত, ইহাই তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক। এই আবোল-তাবোল কবিতাগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে বহুবার অনুরোধ করিয়াছিলাম; তিনি রোগশয্যায় পড়িয়া তাহা ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ছাপা শেষ হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

সুকুমারবাবু হাস্যকৌতুককর অভিনয় ও গান করিতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন; হাস্যকর ছবি আঁকিবার ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ ছিল। এইসব কবিতা গান অভিনয় ছবিতে হাসি থাকিত, কৌতুক থাকিত, কিন্তু কাহাকেও বিদ্রূপ থাকিত না—উহা পড়িয়া শুনিয়া দেখিয়া সকলে আনন্দ পাইত, কেহ আঘাত পাইত না।

সুকুমার-বাবু হাস্যরসিক ছিলেন, কিন্তু ছেব্‌লা ছিলেন না। তাঁহার বাক্যে ব্যবহারে একটি শুচি সংযম ছিল। তিনি গভীর বিষয়ে অভিনিবিষ্ট চিন্তাশীল মনীষী ছিলেন। তিনি গম্ভীর বিষয়ে গভীর চিন্তাপূর্ণ আলোচনা ও রচনা করিতেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি আর্টে ও সাহিত্যে নিপুণ

সমজ্‌দার ছিলেন। সুপ্রযুক্ত স্বল্পবাক্যে তিনি গভীর ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। বিলাতের কোয়েস্ট্‌ (The Quest) নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায়, মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীতে তিনি গম্ভীর বিষয়ে ইংরেজী বাংলা প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রমুখ মনীষীদিগের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন।

সুকুমারবাবুর অন্তর একদিকে যেমন মনীষায় স্বচ্ছ উজ্জ্বল ছিল, অন্যদিকে যেমন আনন্দময়তায় সরস ছিল, অপর দিকে আবার ভগবদ্‌ভক্তি ও ভগবদ্‌-নির্ভরতায় মধুর ছিল। তাহার হৃদয়ের মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়াছিলাম তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুদের রোগের সেবার মধ্যে ও তাঁহার নিজের দীর্ঘকাল ব্যাপী রোগ-ভোগের মধ্যে। বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর অন্তিম পীড়ার সময় সুকুমারবাবু সস্ত্রীক যেরূপ কায়মনোবাক্যে সেবা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অজিতকুমারের অকাল-মৃত্যুতে শোকার্ত্ত আত্মীয়বন্ধুদের সান্ত্বনা দিয়া সুকুমারবাবু গান করিয়া-ছিলেন—

"কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়,
জয় অজানার জয়।"

নিজে সাংঘাতিক কালাজ্বরে আক্রান্ত হইয়াও তিনি নিজের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা কৌতুকপ্রিয়তা হাস্যময়তা হারাইয়া ফেলেন নাই। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর তাঁহার আন্তরিক ছিল বলিয়া তিনি সুখ-দুঃখ রোগশোক দুইই প্রফুল্লভাবে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং পুষ্পের মৃত্যু দ্বারাই যেমন তাহার পরিণতিলাভ হয় ফল হইয়া উঠাতে, তেমনি এই দেহের মৃত্যুতে মানবের জীবনের পরিণতিলাভ ঘটে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন বলিয়া হাসিমুখে ভগবান্‌কে বলিতে পারিতেন—

"দুলিছ গো, দোলা দিতেছ!
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।
সমুখে যখন আসি,
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি!
সমুখে যেমন, পিছেও তেমন,
মিছে করি মোরা গোল!
চিরকাল একই লীলা গো,
অনন্ত কলরোল!
ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে!"

সুকুমারবাবু এই বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন—

"মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মত! জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে' হতেছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালবাসিব নিশ্চয়!"

—এই বিশ্বাসের জোরেই দীর্ঘ আড়াই বৎসর ক্রমাগত রোগ-ভোগ করিয়াও তিনি আসন্ন মৃত্যুকে হাসি দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সদাপ্রসন্ন হাস্যমুখের সামনে মৃত্যু যেন তাহার কৃষ্ণমূর্ত্তি লইয়া আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। তিনি মনের জোরে বহুবার মৃত্যুকে প্রতিহত করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। বহুকাল শয্যাগত থাকার পর গত বৎসর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-উৎসবে সুকুমার-বাবুকে উপস্থিত দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু এ বৎসর বর্ষার অন্তেই অন্তক তাঁহাকে নামশেষ করিয়া অপহরণ করিল।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি শুইয়া শুইয়া "সন্দেশে"র জন্য ছবি আঁকিয়াছেন, শিশু বন্ধুদের আনন্দদানের জন্য আবোল-তাবোলের ছাপার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তাঁহার নিকট হইতে বঙ্গভাষা বাঙালীর কলাশিল্প অনেক কিছু পাইবে আশা করিয়াছিল; মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সের আড়াই বৎসর শয্যাগত অবস্থায় কাটিয়াছিল। এই অল্প বয়সেই তিনি যে প্রতিভার ও চরিত্র মাধুর্য্যের পরিচয় দিয়া গেছেন তাহা অসামান্য। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে পরিবারের ও আত্মীয়-বন্ধুদের ক্ষতি ত হইলই; সমাজের, দেশের, শিল্পের, সাহিত্যের নানা দিকে দারুণ ক্ষতি হইল। আমরা আশা করি ভগবান যাঁহাকে মৃত্যুরূপে ইহলোক হইতে অপসৃত করিয়া লইয়া গেলেন, তাঁহাকে

"নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে
বাঁধিবে এমন প্রেমে।"

কিন্তু তাঁহার বিচ্ছেদকাতর ক্ষতিগ্রস্ত আমরা—

"আজি সে অনন্ত বিশ্বে আছে কোন্‌খানে,
তাই ভাবিতেছি বসি সজল নয়ানে!"

'তত্ত্বকৌমুদী'

১লা আশ্বিন, ১৮৪৫ শক

[পৃ. ১৩১]

"পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১০ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরম প্রীতিভাজন সুকুমার রায় দীর্ঘ ২।। বৎসর কাল রোগের সহিত সংগ্রামের পর মাতা, পত্নী, একমাত্র শিশু-সন্তান ও ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া কিন্তু উজ্জ্বল বিশ্বাসবলে স্বয়ং মৃত্যুভয়কে জয় করিয়া, ৩৫ বৎসব বয়সে চির বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। তাঁহার যেরূপ নানা বিষয়িণী প্রতিভা ও ধর্ম্মভাব ছিল তাহাতে তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ আশার স্থল ছিলেন। তিনি নানারূপে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও ব্রাহ্মসমাজের জন্য খাটিতে ও চিন্তা করিতে বিরত ছিলেন না। তাঁহাব অকালপরলোকগমনজনিত মহা ক্ষতিপূরণ হইবার নহে।"

'তত্ত্বকৌমুদী'

১৬ আশ্বিন, ১৮৪৫ শক

[পৃ. ১৪২]

"বিগত ২৩শে সেপ্টেম্বর পরলোকগত সুকুমার রায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য ও ভ্রাতা শ্রীমান সুবিনয় রায় প্রার্থনা করেন। এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ পঠিত হয়। এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সেবা ভাণ্ডারে ২০০ টাকা, মন্দির সংস্কার ভাণ্ডারে ৫০ ও শান্তিনিকেতনে ৫০ মোট ৩০০ টাকা প্রদত্ত হইবে। ছাত্রসমাজ ও ব্রাহ্মযুবকগণ বিগত ২৯শে সেপ্টেম্বর তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। প্রাতে উপাসনা; শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে স্মৃতিসভা হয়; তাহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির কার্য্য করেন এবং শ্রীযুক্ত গণিতমোহন দাস ও শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বক্তৃতা করেন।"

'The Indian Messenger'

Vol. XII, Calcutta, Sunday, September 16, 1923, No 37

[Page 416-418]

"The Late Sukumar Ray."

"Babu Sukumar Ray, B. Sc., F. R. P. S., who passed away on Monday last and whose loss has cast a gloom over the whole Brahmo Community, was the eldest son of the late Babu Upendrakihsore Raychoudhury, the distinguished artist and pioneer process worker of Calcutta. Through his mother Sukumar was a grandson of the late 'Babu Dwarakanath Ganguli, one of the pioneers of social and political reform in Bengal. In Babu Upendrakishore's nature the artistic element permeated everything ; his conversation, his habit, his occupations, his house hold appointments, his literary efforts were all those of an artist. He was an ardent lover of children ; all children he treated as his friends, and he knew the way of their hearts. His home was one of the most enlightened as well as most cheerful of Brahmo homes.

In such a home and under the loving guidance of such a father, Sukumar's childhood was nurtured. He unconciously imbibed his father's artistic temparament, his genial sympathetic spirit, his love of calture, and of his keen sense of humour. There was a dash of his grandfather Dwarakanth's spirit, too, in him which gave him the courage to stand up boldly for what he beleived to be true or right. At school or College these qualities won for him a circle of close and fast friends. In 1905 he took his B. Sc. degree with double honours and then he formally joined his father's business, though his love of photography had virtually initiated him into the work many years earlier. He also began to help his father in editing the ***Sandesh*** monthly magazine for children.

His active interest in the work of his church, began when he

was at college. From 1902 he was connected with the Students' Weekly Service, first as a member of its Executive Committee, then as its secretary, and latterly as its Vice-President and President. In 1910 we find him taking a leading part in the "Monday Meetings" organised by our late revered minister Pandit Sivanath Sastri for the benefit of young men, and the same year or the year after, Sukumar and some of his close associates founded a Young Men's Prayer Meeting.

In 1911, he went to England, as he secured the Guruprasanna Ghosh scholarship of the Calcutta University, and studied photo-technique in the Manchester College of Technology, where he achived distinction by his researches in half-tone work. He made some original contributions from time to time to the first class photographic journals of England. During his last illness, he was elected a fellow of Royal Photographic Society. In 1913, he read before the London Quest Society a paper on Rabindranath Tagore in which he gave translations from some of his poems ; his paper was widely appreciated.

On his return home towards the end of 1913, he extended and improved his father's process works business. On the death of his father in 1915,he became the editor of the ***Sandesh***. The stories and scientific articles, he wrote for children, his humourous sketches and the numerous picture he drew for the paper were a constant source of delight to the juvenile readers. He also made several contributions of thougthtful and serious nature to the leading Bengali magazines of the day. Like his father he was the children's friend and was a very popular teacher and speaker in our Sunday School and our children's gatherings.

After his return from England, his connection with the work of the Sadharan Brahmo Samaj became closer. He was on its Executive Committee, for sometime as office bearer, and for sometime as an ordinary member, up to the year 1921. In 1916 he and some of his friends organised a "Brahma Young People's Association", in connection with which he occasionaly conducted divine service in the Mandir. He also conducted service on certain Sunday mornings, specially for younger people. Through all these, his thoughtful devout nature found expression. There

was in him a blending of the young with the mature, of a love for social enjoyment with sensitive purity of intellectual keenees with moral dignity, of bold progressiveness with reverent piety, which made all our young people look up to him with affection and respect.

Through a hearty and affectionate friend amongest close associates, he always shrank from giving expression to the devotional side of his nature. To many of his intimate friends, the deapth of his faith in God became evident for the first time only during painful illness from which he suffered for two years and a half, and which eventually carried him away. His suffering was often intense, particularly during the last few days, but his cheerfulness and his trust in God were never dimmed for a single moment. He devoted himself, even while bedridden, to his paper the *Sandesh*, and to the studies and works he loved. It was during this illness that he brought out a remarkable Bengali booklet in verse named অতীতের ছবি (A picture of the past) in which the history of the old *Brahma-Jnan* in India, of the age of darkness and superstition, and of the light breaking again on India through the Brahmo Samaj and its leaders, has been told in simple yet dignified and musical words. Certain immortal verses of the Upanishads have been so well rendered in that book that one feels almost as much inspired by his simple Bengali as by the original Sanskrit. Blest be the sprit that has given the Brahmo Samaj such a treasure even when be set by the agonies of an inexorable malady !

With friends, who came to see him, he always talked cheerfully and with a kindly interest in things and people around. He had learnt to realise God as beauty, Joy and Love and—it was under these aspects that his spirit sought commission with God during the long days and nights of his severe illness. One felt that it would be a sacrilege to suggest anything like death or passing away in that calm and restful presence. About three weeks before his death, he had a long talk with a friend the theme of which was this :— "It is only in our love that we truly live. What we can attain, what we can achieve in life, does not truly measure of success. The Blossoming of the soul by giving

and receiving love both human and Divine,—this is the supreme end and fulfilment of life."

On 29th August when we felt that the end was nearing, he asked poet Rabindranath (who had several times been to see him during his illness) to sing some of his songs of joy. The Poet song at his bed side nine or ten songs that evening. He was very much moved by the one begining with the wards :

দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো,
গভীর শান্তি এ যে, (গীতালি)

i. e. This is not pain, nor is it pleasure ; it is deep peace.

He passed away quietly on the Morning of the 10th instant, leaving behind his beloved wife, his dear boy about 3 years old, his aged mother, young brothers and a large circle of dear friends and relations. He was one of the most promising of our young men. and the loss our Samaj has sustained by his death is immeasurable. May the sorrowing family feel their sorrow shared and soothed ! May his spirit rest in peace ! May his example and memory inspire our young men and women to lead noble, sweet and pure lives !"

'The Indian Messenger'

September 16, 1923.

[Page 418]

"On hearing of the death of Babu Sukumar Ray Chaudhury which melancholy event took place on Monday, the 10th instant, the Executive Committee of S. B Samaj adopted the following resolutions :

The Executive Committee of the Sadharan Brahmo Samaj bears with profound sorrow the news of the premature departure of Babu Sukumar Ray Chaudhury. He sarved the samaj as a minister to the Calcutta Congregation for some year as an assistant secretary to the S. B. Samaj and as a member of the Executive Committee. He was most promising young man of whom the Brahmo Samaj was expecting real contribution to its cause.

He was a great artist, a graceful writer, a deep thinker and he possessed wonderful humour. His many qualities of head and heart endeared him to the Brahmos in general and specially to the young men of the Samaj. By his death the Brahmo Samaj suffered a great loss a loss not likely to be filled up soon "

'The Indian Messenger'

September 16, 1923.

[Page 418-419]

"On hearing of the death of Babu Sukumar Ray the committee of the Students' Weekly Service at a meeting held on Tuesday the 11th September, adopted the following resolution, all the members standing :

The committee of the Students' Weekly Service bears with profound sorrow the sad death of Babu Sukumar Ray Chaudhury at the early age of 35, after a protracted illness of two years and a half. He was president of the S. W. Service for several years and its member and benefactor for over twenty years. He was the leader of the Brahmo young men of the present age and ardent enthusiasm, great moral and spiritual fervour inspired a new life into their hearts. He was worshipper of God the blissful. As a minister of the congregation of the Sadharan Brahmo Samaj he endeard himself to all by his service and sermons. His amible disposition, broadness of views, love for the Brahmo Samaj and the sacred cause it holds, deep insight into things spritual, his literary genious, specially juvenile members, and his love of arts won for him the love and respect of the young and the old alike. His premature departure from this world has left a void in the Brahmo Samaj not likely to be filled up in the near future.

No other business of the committee was transacted and the meeting was adjourned in honour of the departed."

'ভারতী'

আশ্বিন, ১৩৩০

'সুকুমার রায়'

"বাংলার শিশুসাহিত্যের ওস্তাদ লেখক বিখ্যাত আর্টিণ্ট শ্রীযুক্ত সুকুমার রায়চৌধুরী ইহলোকে নাই। সুকুমার উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রায় আড়াই বৎসর কাল তিনি কালাজ্বরে ভুগিতেছিলেন— মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হইয়াছিল ৩৭ বৎসর মাত্র।

স্কুল-কলেজে সুকুমার চরিত্রগুণে সকলের স্নেহ ও প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। সসম্মানে বি-এস-সি পাশ করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি লাভ করেন ও বিলাত যান। সেখানে ম্যাঞ্চেণ্টারে ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত নানা কায়দা-কানুন, ও ব্লক তৈয়ারী শিখিয়া আসেন। তাঁর পিতা ৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় বাঙলাদেশে হাফটোন ব্লকে সর্বপ্রথম কৃতিত্ব দেখান। সুকুমার দেশে ফিরিয়া হাফটোন ব্লকে সোনার রঙ ফলান। শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁর নানা প্রবন্ধ বিলাতের বিখ্যাত পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে যশস্বী করিয়া তোলে এবং তিনি রয়েল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

ব্লক করা, ছবি আঁকা ছাড়া লেখারও তাঁর ক্ষমতা ছিল। অসাধারণ হাল্কা ছন্দে অত্যন্ত হালকাভাবে যা তা লইয়া কবিতা লেখায় সুকুমার সিদ্ধহস্ত ছিলেন—এরকম লেখায় তাঁর আর একটি জুড়ি ছিল না। তাঁর সম্পাদিত শিশু মাসিক 'সন্দেশে' হাসিভরা তাঁর কবিতার রাশি হীরার কুচির মতই ছড়ানো আছে। এ রকম কবিতা এক তাঁর কলমেই বাহির হইয়াছে। বাঙলা সাহিত্যে তিনিই এ কবিতার আমদানি করেন। সেই কবিতাগুলি 'আবোল তাবোল' নামে গুচ্ছাকারে সংপ্রতি সংগৃহীত হইয়াছে।

এই দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়াও তিনি তাঁর শিল্পচর্চা ছাড়েন নাই—ইহার মধ্যে তিনি ছবি আঁকিয়াছেন, সন্দেশ সম্পাদন করিয়াছেন। ছেলেমেয়েদের জন্য কত রচনাই না লিখিয়াছেন। এ-সব ছাড়া অভিনয় কলাতেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল অসীম। গানে ও হাস্যকৌতুকের অভিনয়ে বড় বড় মজলিশ তিনি মুগ্ধ রাখিতেন।

অমায়িক চরিত্র। দরদী বন্ধু, নিপুণ শিল্পী, ওস্তাদ লিখিয়ে—সুকুমার রায়কে হারাইয়া আজ বাংলা সাহিত্যের ও সমাজের যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ হইবার নয়।"

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'

আশ্বিন, ১৩৩০

'শোক-সংবাদ'

"৺সুকুমার রায়চৌধুরী—৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺সুকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় প্রায় আড়াই বৎসরকাল কালাজ্বরে ভুগিয়া ৩১শে ভাদ্র সোমবার প্রাতঃকালে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইহার বয়ঃক্রম মাত্র ৩৭ বৎসর হইয়াছিল। এই প্রতিভাবান যুবক 'সন্দেশে'র সুযোগ্য সম্পাদক-রূপে বাঙ্গালা ভাষায় শিশুসাহিত্যকে একটি বিশিষ্ট আকার দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এবিষয়ে ইহার দক্ষতা অসামান্য ছিল। এক্ষেত্রে ইহার প্রতি-দ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। ইহা ছাড়া চিত্রকলার ইনি একজন সুনিপুণ শিল্পী ছিলেন। চরিত্রের মাধুর্য্যে ইনি সহজেই সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিতেন। ভগবৎ বিশ্বাসে ইনি আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের আদর্শস্থল ছিলেন। এরূপ একজন চরিত্রবান ক্ষমতাশালী সাহিত্যিক ও শিল্পীকে হারান বাঙ্গলার পক্ষে বিশেষ দুর্ভাগ্যের বিষয়। ইহার পরিবারবর্গকে আমাদের গভীর সহানুভূতি জানাইতেছি। তাঁহাদের এই প্রগাঢ় শোকে ভগবান সান্ত্বনা প্রদান করুন এবং লোকান্তরিত আত্মাকে আপনার স্নেহাশ্রয় দান করুন।"

তাতাদার স্মৃতি

সুশোভন সরকার

তাতাদার (সুকুমার রায়) সঙ্গে আমার আলাপ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে। আমি তখন কলকাতায় আই. এ. পড়ব বলে এসেছি।

যখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়, তখন নব্য-যুবকদের মতো আমিও তাঁকে তাতাদা বলে ডাকতুম। সেই সময় পুরোনো ছাত্রসমাজকে পুনর্গঠিত করবার একটা প্রচেষ্টা ব্রাহ্ম-যুবকেরা হাতে নিয়েছিলেন। তাঁদের নেতা সুকুমার রায় এবং তার পরেই প্রশান্ত মহলানবিশ। তখন ছাত্রসমাজের সভ্য হতে গেলে কতকগুলি নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি দিতে হত। সংস্কারকরা সেই বিধি সংশোধন করে ইতিবাচক কয়েকটি লক্ষ্যের দিকে ঝোঁক দিয়ে নতুন প্রবেশপত্র রচনা করেন।

এইজন্য একটি কমিটি গঠিত হয়ঃ Rules Revision Committee. কেন জানিনা আমাকে তা'তে নেওয়া হয় এবং সেই সূত্রে আমি এই নতুন আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি।

ছাত্রসমাজ পুনর্গঠিত হলে তা'তে অ-ব্রাহ্ম সভ্যদের নেওয়া হতে থাকে। নিয়মিত ও বিশেষ অধিবেশন ছাড়া ছাত্রসমাজের সভ্যদের active করার জন্য কয়েকটি সমিতি গঠিত হয় ১৯১৯/২০ সালে। সেগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল ফ্রেটারনিটি। ফ্রেটারনিটি ছিল চারটিঃ ডিভোশানাল, এডুকেশানাল, লিটারারি ও সোশ্যাল। সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ ভবনের সংলগ্ন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ঘরে এর বৈঠকগুলি হত। পরে প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরীর বাড়ীর ছাদে বৈঠকের আয়োজন হয়। এই চারিটি ফ্রেটারনিটির মধ্যে সোশ্যাল-ফ্রেটারনিটি বৈঠকের কিছু বিবরণ আমি 'দেশ' পত্রিকায় লিখেছি।

ইতোমধ্যে ছাত্রসমাজের প্রাথমিক আন্দোলন ছাপিয়ে ব্রাহ্মসমাজে এক বৃহত্তর আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যায়। সেই আন্দোলনেই সংস্কারকদের নেতৃত্ব করেন সুকুমার রায়। আর তাঁর সহকারী থাকেন প্রশান্তচন্দ্র। আন্দোলনের কেন্দ্রে ছিল নবীন ব্রাহ্মদের প্রস্তাব, যে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনারারি সভ্য নিবাচন করতে হবে। অনারারি সভা নির্বাচন করার রেওয়াজ অবশ্য আগে থেকেই ছিল। এই প্রস্তাবে প্রবীণ ব্রাহ্মরা তুমুল আপত্তি তোলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের মনে বিশ্বাস ছিল যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্ম ছিলেন না। নবীন ব্রাহ্মরা অপরদিকে মনে করতেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদার আদর্শকে জোরদার করতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটা সংযোগ প্রয়োজন। প্রশান্তচন্দ্রের 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই' পুস্তিকায় এই প্রভাবের সমর্থনে সমস্ত যুক্তি প্রকাশিত হয়েছে।

প্রবীণ-ব্রাহ্মরা সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃত্বে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে নির্বাচিত হতে বাধা দেবার মতো তাঁরা নিয়মতন্ত্র-বিরোধী কিছু কাজ করতে থাকেন। প্রতি অধিবেশনে সুকুমার রায় প্রস্তাব করতেন যে, রবীন্দ্রনাথকে নির্বাচন করা হোক আর প্রস্তাব সমর্থন করতেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। কিন্তু কর্তৃপক্ষ প্রতিবারই নানা কৌশলে নিয়মতান্ত্রিক-ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করে সে প্রস্তাব নাকচ করে দিতে থাকেন। এক সময়ে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, মনে হত ব্রাহ্মসমাজ আর একবার split হবে। এ রকম এক মুহূর্তে যুবকদের দল সুকুমার রায়ের নেতৃত্বে স্থির করেন যে, আসন্ন বাৎসরিক মাঘোৎসব তাঁরা বর্জন করবেন। সেই পৃথক উৎসব সংগঠিত হয়েছিল প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরীর বাড়ীর ছাদে চাঁদোয়া খাটিয়ে। এই বাড়ীর ছাদেই পরে সোশ্যাল ফ্রেটারনিটির বৈঠক বসতো।

Split এড়ানো গেল কয়েকজন ব্রাহ্ম-আইনবিদের মধ্যস্থতায়। তাঁরা নির্দেশ

দিলেনি যে মন্দিরে অধিবেশনের বদলে শহর ও মফস্বলে ছড়ানো ব্রাহ্মসমাজের সকল সভ্যদের একটা referendum করতে। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে সেই referendum অনুষ্ঠিতহয় এবং রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত-সদস্য নির্বাচিত হন।

ঠিক এর পরেই সুকুমার রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। পুত্র সত্যজিতের জন্মের কিছু আগে। তাঁর হয়েছিল দুরারোগ্য কালাজ্বর ব্যাধি, যার ওষুধ তখনো আবিষ্কার হয়নি।

১৯২১-২৩ তিনি নানারকম চিকিৎসা করান। নানা জায়গায় হাওয়া বদল করেন, কিন্তু সমস্তই বৃথা হল। তাঁর অভাবে ব্রাহ্মযুবকদের আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে গেল। প্রশান্তচন্দ্র ও অন্যান্য কয়েকজন ঠিক এই সময়ে নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর কাজে নিজেদের নিযুক্ত করাতে ব্রাহ্ম যুব-আন্দোলন শেষ হয়ে যায়।

১৯২১-এর গ্রীষ্মকালে সুকুমার রায় কিছুদিন দার্জিলিং-এ Lewis Jubilee Sanatorium-এ একটি প্রথম শ্রেণীর ঘরে ছিলেন। সেই বৎসর আমরা কয়েকজন বন্ধু (শরদিন্দু ঘোষাল, বিমল সিদ্ধান্ত, সুধীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ) গরমের ছুটিতে ওই স্যানাটোরিয়ামে যাই। আমি এক-সপ্তাহ তাতাদার ঘরে ছিলাম। তারপর ভাড়া বেশী বলে স্যানাটোরিয়ম-এ অন্যান্য বন্ধুর সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীতে চলে যাই। কিন্তু আমরা সকলে রোজই একবার তাতাদার ঘরে এসে জমতাম। তিনি তখন খুব অসুস্থ। কিন্তু মনে প্রশান্তি ছিল অসম্ভব। মনে পড়ে তিনি বললেন—একটি কবিতা লিখেছি শোনো। বলে আবৃত্তি করলেন 'বাবুরাম সাপুড়ে' কবিতাটি।

আর একটা ব্যক্তিগত স্মৃতি বলি। ব্রাহ্মসমাজে যুবক আন্দোলনের সময়ে একবার 'চলচিত্তচঞ্চরী' নাটক করার কথা হয়। তাতাদা আমাদের সমস্ত লেখাটা একদিন পড়ে শোনান। তাঁর অন্তর্গত গানগুলি নিজে গান। পাঠকের মনে পড়বে ওই নাটিকাটিতে একদিকে রক্ষণশীল ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, অন্যদিকে আশ্রম-জীবনের বিকৃতির প্রতি তীব্র শ্লেষ আছে। মনে পড়ে তাতাদা যখন নাটিকাটি পড়ে শোনালেন, তখন আমি বলেছিলাম যে অভিনয় করার আগে এটাকে Up-to-date করে নিলে ভালো হয়; অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছিল সেটাকে যদি আর একটু reflect করা যায় তবে ভাল হয়। Up-to-date করার কথায় তাতাদা হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। অভিনয়ের ব্যবস্থা খানিকটা এগিয়েছিল। অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে আমি সমস্তটাই হাতে লিখে নিয়েছিলাম অভিনয়ের সুবিধার জন্য। (আমার কাছে অমূল্য সেই প্রতিলিপি কোথায় আছে জানিনা)। অভিনয় অবশ্য হল না।

আর একটি ব্যক্তিগত স্মৃতির কথা এখানে বলা যায়। তাতাদার অসুখের খুব বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ওঁকে দেখতে এলেন গড়পাড়ের বাড়ীতে।

ঘটনাচক্রে-আমরা উপস্থিত ছিলাম। তাতাদা রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন ('গীতালি' থেকে ?) একটি গান গেয়ে শোনাতে এবং কোনটি তাও নির্দেশ করে দিলেন, 'দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো—গভীর শান্তি এ যে'। রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর গেয়ে শোনালেন আমাদের সামনে। পরে শুনেছিলাম ওই কবিতাটিতে সুর দেওয়া ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তখনই বসে বসে সুর দিয়ে গেয়ে শোনান।

আমি এম.এ. পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হই। কথা আছে তারপর বিলাত যাব। এমন সময় হঠাৎ একদিন খবর এল তাতাদা মারা গেছেন। আমরা সকলে ছুটলাম—তাঁর মরদেহ অনুসরণ করে নিমতলা ঘাটে শেষকৃত্যের জন্য। সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ে একটা দৃশ্য এখনও মনে পড়ে। গাড়ী করে একজন সাহেব যাচ্ছিলেন। তিনি গাড়ী থামিয়ে মাথার থেকে টুপি তুললেন। এটা একটা সাহেবী প্রথা। কিন্তু আমরা তখন অত্যন্ত moved হয়েছিলাম।

তাতাদার মৃত্যুতে ব্রাহ্ম-যুবক-আন্দোলন ছারখার হয়ে গেল এবং ব্রাহ্ম-সমাজে যে নতুন চেতনার স্পন্দন এসেছিল তাও শেষ হয়ে গেল বলা চলে।

অধ্যাপক সুশোভন সরকার কর্তৃক নিবন্ধাকারে বিবৃত এবং গ্রন্থকার কর্তৃক লিপিবন্ধ

[৭ জুন, ১৯৮১

২৩৯এ নেতাজী সুভাষ রোড

কল. ৪৬]

F. R. P. S.-সংক্রান্ত একটি চিঠির প্রতিলিপি

**The Royal
Photographic
Society**

The Octagon. Milsom Street. Bath BA1 1DN. Telephone Bath (0225) 62841. Secretary Kenneth Warr BA FSAE FBIM

Mr H K Adhya
50 Pataldanga Street
Calcutta, 700 009
India.

Our Ref KRW/MAB
18th January 1982

Dear Mr Adhya

...The information which we can give you is that Mr S Raychaudhuri was elected as a member of The Royal Photographic Society in 1912 and admitted as a Fellow on December 12th 1922. I should point out that it was a Fellowship and not an Honorary Fellowship to which he was admitted.

Apart from this I am afraid this is the only information I can give you.

yours sincerely
KENNETH R WARR
Secretary

The Royal Photographic
Society of Great Britain
A Company limited by guarantee
Registered in England No 42900
VAT Reg No 242 4122 07
At The RPS National
Centre of Photography

সুকুমার রায় ঃ

জীবন-পঞ্জি

১৮৮৫

বিধুমুখীকে উপেন্দ্রকিশোরের বিবাহ (১৫ জুন)। ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে বসবাস শুরু।

১৮৮৬

সুখলতার জন্ম (৬ কার্তিক ১২৯৩ সন)।

১৮৮৭

সুকুমারের জন্ম (৩০ অক্টোবর, ১৩ কার্তিক ১২৯৪)।

১৮৮৯

পুণ্যলতার জন্ম (২ ভাদ্র, ১২৯৬)।

১৮৯০

সুবিনয়ের জন্ম (১২ অগ্রহায়ণ, ১২৯৭)।

১৮৯২

শান্তিলতার জন্ম (১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯)। সুকুমার সম্ভবত এই বছরই 'ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়'-এ ভর্তি হন।

১৮৯৫

'U. Ray-Artist' নামে উপেন্দ্রকিশোর ব্যবসা শুরু করেন। এই বছরই উপেন্দ্রকিশোর ৩৮/১ শিবনারায়ণ দাস লেনের ভাড়াবাড়িতে চলে আসেন।

১৮৯৬

সুকুমারের সাহিত্য-চর্চার প্রথম ফসল 'নদী' কবিতা প্রকাশিত হয় 'মুকুল' পত্রিকায় (২য় ভাগ সংখ্যা ২, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ)। [আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসুর উৎসাহ ও প্রেরণায় যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের' পক্ষ থেকে এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকা-সম্পাদনার ভার ছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর ওপর।]

১৮৯৭

৩৮/১ শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়িতে সুবিমলের জন্ম (২ ভাদ্র, ১৩০৪)। ১২ জুন অপরাহ্ণে কলকাতা ও অন্যত্র প্রবল ভূমিকম্প।

১৮৯৮

কলকাতায় প্লেগের প্রকোপ ; উপেন্দ্রকিশোর সপরিবারে মসুয়ায় (জুন)। মসুয়া থেকে ফেরার কয়েকদিন পর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু (২৭ জুন)।

১৯০০-১৯০১

এই সময়ে ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের একাংশ ভাড়া নিয়ে উপেন্দ্রকিশোর সপরিবারে চলে আসেন।

১৯০২

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে, এফ. এ. পড়বার জন্য ভর্তি হন সিটি কলেজে। Students' Weekly Service বা ছাত্রসমাজের সঙ্গে যুক্ত হন এ বছর।

১৯০৪

এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন।

উপেন্দ্রকিশোর সপরিবারে দার্জিলিং বেড়াতে যান। ফিরে এসে শোনেন কুলদারঞ্জন রায়ের স্ত্রী স্বর্ণলতার মৃত্যু হয়েছে।

বিলেতের 'Boy's Own Paper' পত্রিকায় আয়োজিত ফটো তোলা প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার পান সুকুমার ('All Ages' গ্রুপের 'Pets' বা 'পোষা জীবজন্তুর ছবি' বিভাগে)।

১৯০৫

উপেন্দ্রকিশোরের সপরিবারে পুরী ভ্রমণ। প্রমদারঞ্জনের সঙ্গে সুরমা ভট্টাচার্যের বিবাহ।

১৯০৬

মোটামুটি এই সময় ননসেন্স ক্লাবের সূচনা।

১৯০৭

ডবল অনার্স নিয়ে (রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা) প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এস-সি. পাশ।

সুখলতার বিবাহ : উড়িষ্যার ভক্তকবি ও শিক্ষক মধুসূদন রাও (১৮৫৩-১৯১২)-এর পুত্র ডাঃ জয়ন্ত রাও-এর সঙ্গে।

১৯০৮-১৯০৯

অরুণনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে পুণ্যলতার বিবাহ।

১৯১০

সুকুমারের উদ্যোগে 'ব্রাহ্ম যুব সমিতি' গঠিত ও এই সমিতির মুখপত্র 'আলোক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৯১১

বোম্বে থেকে বিলেত পাড়ি (৭ অক্টোবর)। লন্ডনে পৌঁছন ২৩ অক্টোবর। ২৫ অক্টোবর ভর্তি হন L. C. C. School of Photoengraving & Lithographyতে।

১৯১২

ম্যাঞ্চেস্টারের মিউনিসিপ্যাল স্কুল অব টেকনোলজিতে ভর্তি হলেন (অক্টোবর)।

পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা ও সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মন-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে এসে পৌঁছন (১৬ জুন)। এই বছর অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা যাত্রা।

১৯১৩

সুকুমার ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লন্ডনে ফিরে এলেন (মে)।

রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে লন্ডনে ফিরে এলেন (১৪ এপ্রিল)।

সুকুমার রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহন ঘোষের সঙ্গে লিভারপুল থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর জাহাজে চেপে কলকাতায় ফিরে আসেন ২৯ সেপ্টেম্বর।

জগচ্চন্দ্র দাশের কন্যা সুপ্রভাকে বিবাহ (১৩ ডিসেম্বর)।

প্রভাত চৌধুরীর সঙ্গে শান্তিলতার বিবাহ (২৬ ডিসেম্বর)।

১৯১৪

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সহকারী সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত।

১৯১৫

১০০ নম্বর গড়পার রোডে বাড়ি করে চলে এলেন উপেন্দ্রকিশোর (ডিসেম্বর ১৯১৪ অথবা জানুয়ারি ১৯১৫-র কোন একসময়ে)।

মানডে ক্লাবের সূচনা। পরিকল্পনা পাকা হয় ২৬ এপ্রিল, প্রথম অধিবেশন ২১ অগস্ট—অমল হোমের বাড়ি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসে এই ধরণের ক্লাব করার কথা ওঠে।

সুবিনয়ের বিবাহ (ডিসেম্বর, ১৯১৫)।

উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু (২০ ডিসেম্বর)।

১৯১৬

সন্দেশ পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ (মাঘ, ১৩২৪ সংখ্যা থেকে)।

১৯১৯

শান্তিলতার মৃত্যু (৭ এপ্রিল)।

১৯২০

উপেন্দ্রকিশোরের গর্ভধারিণী জয়তারার মৃত্যু।

১৯২১

ময়মনসিংহে সম্পত্তি-সংক্রান্ত প্রয়োজনে গিয়ে কালাজ্বরে আক্রান্ত হলেন সুকুমার (মাঘ)।

পুত্র সত্যজিতের জন্ম (২১ মে)।

১৯২৩

মৃত্যু : ১০ সেপ্টেম্বর, সকাল ৮-১৫ মিনিট।

সুকুমার রায়ের বংশলতিকা

পিতৃকুল

মাতৃকুল

নির্দেশিকা

[পাদটীকার অন্তর্গত বিষয়গুলি বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে।